৬.০৮ রহস্য গুহা – Bangla Library

৬.০৮ রহস্য গুহা – Bangla Library

ফাংহা গুপ্তঘাটিতে যারা আটক ছিলো তাদের কি করছো রহমান?

সর্দার, আপনার নির্দেশমতই কাজ করেছি।

হাঁ, তাই ভালো! ওদের মত মহাপাপীদের নিঃশেষ করে ফেলাই ভালো হয়েছে। যারা দেশের ও দশের শত্রু তাদের জীবিত রেখে কোনো লাভ হতো না। দেশের জনগণের গ্রাস নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলতে, নিজেদের ঐশ্বর্যের ইমারত গড়ে তুলেছিলো পর্বত সমান, তবু তাদের লোভ কমেনি এতটুকু। রহমান, হিরন্ময়ের লাশটা ফাংহার রাস্তায় ঝুলিয়ে দিও এবং তার গলায় একটা কাগজ লটকে দিও, তাতে লিখা থাকবে জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকার পরিণাম।

আচ্ছা সর্দার।

রহমান, আমাকে একবার কান্দাই যেতে হবে।

খোন্দকার বাড়ির রহস্য উদঘাটন,

আপাতত স্থগিত থাকবে, কারণ কান্দাই যাওয়া আমার একান্ত প্রয়োজন। হাঁ আর একটা কথা, মিস রীণার বাসায় তুমি থাকবে।

সর্দার!

হাঁ, তোমাকেই থাকতে হবে, কারণ সে বড় অসহায়, তাকে দেখা আমার কর্তব্য। আর শোনো, ভুলুকে বলে দিও আপাতত তার ছুটি। নতুন মানুষকে বিশ্বাস নেই।

ওর নাকি আর কেউ নেই, বাড়িঘর বা আত্নীয় স্বজনও নেই, তাই ও থাকতে চায় একেবারে।

কিন্তু আপাতত তাকে রাখা হচ্ছে না। একটু থেমে বলল বনহুর–কিছুদিনের জন্য তাকে যেতে বললো, তারপর আবার তাকে রাখা হবে।

আচ্ছা সর্দার।

এখন তুমি মিস রীণার ওখানে যাও এবং এ কথাটা তাকে বলে দিও। কথাগুলো বলে বনহুর বেরিয়ে গেলে সেখান থেকে।

বনহুর গাড়িতে চেপে বসলো।

রহমান দাঁড়িয়ে রইলো, নির্বাক হয়ে ভাবছে সে কতদিন পর কান্দাই যাওয়া তার ভাগ্যে জুটবে কে জানে!

বনহুর চলে যেতেই রহমান রীণার বাড়ি অভিমুখে রওনা দিলো। পথে কিছু কাজ ছিলো সেরে যখন রহমান মিস রীণার বাড়িতে পৌঁছলো তখন খোন্দকার বাড়ির সামনে বেশ ভিড় জমে উঠেছে দেখতে পেলো সে।

এগুতেই দেখলো ভুলুকে ওরা ধরে ফেলেছে। একজন বলছে লোকটা গেটের মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো।

রহমানকে দেখেই ভুলু হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো।

রহমান ভুলুকে হাতবাধা অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলো, সে এগিয়ে আসতেই ভুলু। বললো–রহমান ভাই, দেখুন এরা আমাকে ধরেছে। আমি পুকুরপাড়ে যাচ্ছিলাম পানি খাবো বলে।

রহমান বললো–পানি বাসায় ছিলো না যে তুমি পুকুর পানি খেতে যাচ্ছিলে?

সত্যি বিশ্বাস করেন রহমান ভাই...,

খোন্দকার বাড়ির একজন বলে উঠলো–বিশ্বাস করার কি? তুমি নিশ্চয়ই কোনে অভিসন্ধি নিয়ে খোন্দকার বাড়ির গেট পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলে।

না হুজুর, সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি পুকুরে পানি খেতে যাচ্ছিলাম। আমার হাতের বাঁধন খুলে দিতে বলুন। রহমান ভাই?

রহমান খোন্দকার বাড়ির লোকদের ডেকে বললো–দেখুন আপনারা একে সম্পূর্ণ ভুল করে ধরেছেন। আসলে ভুলু আমাদের বাড়ির চাকর। ওর মাথার কোনো ঠিক নেই, তাই ও হঠাৎ নানা কিছু ভুল করে বসে।

রহমানের কথায় খোন্দকার বাড়ির লোকরা ভুলুকে ছাড়তে পারলো না, তারা ডাকলো খোন্দকার জামান সাহেবকে। জামান সাহেব এলে রহমান তাকে বুঝিয়ে

বললো ব্যাপারটা, তখন তিনি লোকজনদের বললেন ভুলুকে ছেড়ে দিতে।

রহমানের কথায় ভুলু যখন মুক্তি পেলো তখন তার আনন্দ আর ধরে না, সে এসে রীনার কাছে নালিশ জানালো,–রীনা আপা, দেখুন খোন্দকার বাড়ির লোকরা বড় বদ, ওরা আমাকে পানি খেতে দেবে না। ওদের পুকুরে কত পানি– জানেন রীনা আপা, আমি ওদের পুকুরে পানি খাবো বলে যেমনি গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেছি, অমনি ওরা আমাকে ধরে ফেললো.... প্রায় কাদ কাদ হয়ে কথাটা বললো ভুল।

রীনা তো হেসেই খুন, বললো সে–ভুলু, তোমার যখন পানির পিপাসা হয়েছিলো সোজা বাড়ি চলে এলেনা কেন? বাড়িতে কত পানি, আর তুমি গিয়েছিলে পুকুরে পানি খেতে! খবরদার, আর যাবে না, কিন্তু আমি তোমাকে বারণ করে দিচ্ছি।

এই কান–নাক মলোম, আর যাবো না! ভুলু কথাটা বলেই চলে যাচ্ছিলো, রহমান বললো–ভুল, শোনো কথা আছে।

ভুলু দাঁড়িয়ে পড়লো।

রীনা বললো–কি কথা রহমান সাহেব!!

রহমান বললো–মিঃ আলম বলেছেন তিনি কয়েকদিনের জন্য দেশে যাবেন.....

হাঁ, সে কথা তিনি আমাকেও বলেছেন।

তাই তিনি বললেন ভুলুকে আপাতত কয়েকদিনের জন্য ছুটি দিতে।

কিন্তু ও যাবে কোথায়? ওর তো বাড়িঘর বা আপনজন বলতে কেউ নেই।

ভুলু তখন বলে উঠলো– বড় সাহেব যখন বলেছেন তখন আমাকে যেতেই হবে। একটু ভেবে বলে ভুলু–হ, এবার মনে পড়েছে, আমার দূর সম্পর্কের এক মামাতো ভাইয়ের ফুফাতো বোনের স্বামীর বড় বোন আছে। বড় আদর করে আমাকে ঠিক নিজের বোনের মত। অনেকদিন তার ওখানে যাইনি। যদি দুটি দেন তবে সেখানে গিয়ে কয়েকদিন কাটিয়ে আসবো। বড় সাহেব কি করে যে আমার অন্তরের কথা বোঝেন তাই ভেবে আমি অবাক হই। সত্যি বড় সাহেব বড় ভাল মানুষ, তিনি যখন বলেছেন তখন.....

তাইবলে এক্ষণি চললে নাকি?

দেরী করে কি হবে, আবার আসতে হবে তো? চলি রীনা আপা?

আমার নাম ধরে ডাকার সাহস কি করে পেলে ভুলু?

বড় সাহেব বলে দিয়েছেন সবার নাম ধরে ডাকতে, তবে নামের শেষে যেন ফাঁকি না দেই। কি রহমান ভাই, সত্যি বলিনি আমি?

তুমি যাও ভুলু, এত বক বক করো না।

ভুলু চলে যায়।

রহমান বলে–মিস রীনা, আমি বুঝতে পারি না ঐ পাগলটাকে রেখে কি হবে! ওর মাথায় এতটুকু বুদ্ধি নেই।

কিন্তু জানেন মিঃ রহমান, যখন বাড়িতে কেউ থাকে না, তখন ঐ ভুলুকে আমার মনে হয় যে, মস্তবড় এক সাহসী পুরুষ। ও পাগল হোক আর যাই হোক, আমার কিন্তু ওর উপর ভারী বিশ্বাস.....

এমন সময় ভুলু পুটলি বগলে এনে দাঁড়ায়।

রীনা বলে উঠে–কি ভুলু, পুঁটলি নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? আবার আসবে তো?

রীনা আপা, যদি না আসি তাহলে প্রথম দিনই তো পালিয়ে যেতে পারতাম।

বেশ বেশ, আসবে কিন্তু......

ঠিক আসবো।

কথাটা বলে খুশি হয়ে চলে যায় ভুলু।

রহমান বলে–যদি ও আবার ফিরে আসে তাহলে বুঝবো ও সত্যিকারের বিশ্বাসী, আর যদি ফিরে না আসে মনে রাখবেন ও শুধু অবিশ্বাসীই নয়, একটা জোচ্চর।

আপনি মিথ্যে অবিশ্বাস করছেন, আমার মন বলছে ও ঠিক আসবে। এই যা ভুলেই গেছি ওকে আসার তারিখটা ঠিকমত বলে দিতে।

সত্যি ভুল হলো। রহমান কথাটা বললো।

দেখুন না মিঃ রহমান, ভুলু আছে কিনা বাইরে। আমার মনে হয় ও বেশিদূর যেতে পারেনি।

আচ্ছা দেখছি। রহমান বেরিয়ে যায়।

বাইরে বেরিয়ে তাকায় এদিক ওদিক কিন্তু কোথাও ভুলুকে দেখতে পায় না রহমান। ফিরে আসে সে বাড়ির ভিতরে। মনে তার কেমন যেন সন্দেহের ছোঁয়া লাগে, লোকটা সত্যি কি পাগল না কোনো ছদ্মবেশী গুপ্তচর। বাড়ি থেকে বাইরে গেলো আর অমনি সে হাওয়ায় উবে গেলো!

তবু রহমান রীনাকে এ ব্যাপারে কোনো কথা বললো না, শুধু বললো–ভুলু চলে গেছে।

রহমান নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

রীনার কক্ষের পাশের কক্ষেই থাকে রহমান, কারণ রীনার কক্ষের ছাদেই নাকি দেখা যায় ছায়ামূর্তি।

রীনা রহমানকে নিজের কক্ষের পাশের কক্ষেই স্থান দিয়েছে।

রহমান নিজ কক্ষে প্রবেশ করে ভাবছে ভুলুর কথা। মিস রীনা আলগোছে দেহটা এলিয়ে দেয় বিছানায়। একা একা এত বড় বাড়িটায় মোটেই ভালো লাগে না তার। রীনা কিছুক্ষণ শুয়ে কাটানোর পর এসে দাঁড়ায় মুক্ত জানালার পাশে। এখানে থেকে খোন্দকার বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়।

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে রীনা খোন্দকার বাড়িটার দিকে।

এমন সময় সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শোনা যায়।

ছোট্ট বয় ছুটে এসে বলে–আপামনি, বড় সাহেব এসেছেন।

রীনা এ বাড়িতে আসার পরপরই ছোট্ট চাকরটাকে কাজে বহাল করেছিলো। বেশ চটপটে ছেলেটা, কথাও বলে সে দ্রুত। ছোট্ট হলেও ছেলেটা কাজের বলতে হবে।

রীনার চোখ দুটো খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

এগিয়ে এলো সে দরজার পাশে।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করে বললো–মিস রীনা, বিশেষ জরুরি কাজে আমি কিছুদিনের জন্য ফাংহার বাইরে যাচ্ছি। রহমান রইলো, কোনো অসুবিধা হবে না।

রীনার চোখ দুটো আপনাআপনি ছলছল হয়ে এলো–হঠাৎ এভাবে আপনি চলে যাবেন সত্যি ভাবতে পারিনি। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে....

মিস রীনা, আপনি বেশি ভাবছেন! ভাবার কোনো কারণ নেই। আজ চলি মিস রীনা? ও, রহমান কি এসেছে।

হাঁ, উনি পাশের ঘরে আছেন। ডাকবো?

দরকার নেই, আমি নিজেই যাচ্ছি।

বনহুর স্বয়ং রহমানের কক্ষের দিকে পা বাড়ালো।

কক্ষে প্রবেশ করতেই রহমান চমকে উঠে দাঁড়ায়ে কুর্ণিশ জানালো– সর্দার আপনি!

হাঁ, আমি এলাম যাবার পূর্বে মিস রীনার সঙ্গে একবার দেখা করে না গেলে কেমন হবে! একটা কথা?

বলুন সর্দার

ফাংহা ডাকবাংলোর অভ্যন্তরে যে আলমারীটা আছে ওর মধ্যে আছে ঝুমা আর আর্মের লাশ।

হাঁ সর্দার।

রহমান, জানো আমি প্রায় রাতেই স্বপ্ন দেখি ঝুমা বলছে, বারু আমাকে উদ্ধার করুন, আমি আর থাকতে পারছি না! রহমান, জানি না কেন আমি এমন ধরণের স্বপ্ন দেখি...... বনহুর চিন্তিত হয়।

রহমান বলে সর্দার, ওটা আপনার মনের খেয়াল।

না না রহমান, আমার মনের খেয়াল নয়। ঝুমা মরে গিয়েও শান্তি পাচ্ছে না। ঐ বন্ধ আলমারীর মধ্যে আর্মকেও আমি বন্দী করে রেখেছিলাম। ঝুমাকে হত্যার প্রায়শ্চিত্ত আমি করেছি। ঝুমাকে যেমন ভাবে সে হত্যা করেছে, তেমনিভাবে আমিও তাকে হত্যা করেছি, কিন্তু.......

বলুন সর্দার?

ঝুমার আত্মা নিশ্চয়ই স্বস্তি পাচ্ছে না, তাই আমি নিজেও স্বস্তি পাচ্ছি না রহমান।

সর্দার, আপনি ফিরে আসুন, ঐ আলমারী থেকে ঝুমার মৃতদেহ আমরা সরিয়ে নেবো।

হাঁ, তাই করতে হবে। রহমান, মিস রীনার দিকে খেয়াল রাখবে তার যেন কোনো অসুবিধা না হয়।

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর বেরিয়ে গেলো, সিঁড়িতে জেগে উঠলো বনহুরের ভারী ভুটের আওয়াজ।

রীনা দৌড়ে গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালো, যেখানে থেকে দেখা যায় নিচের রাজপথ।

বনহুরের গাড়িখানা বেরিয়ে গেলো।

রীনা ফিরে এলো বিছানায়। ভাবে সে অদ্ভুত মানুষ এই মিঃ আলম, যেমন তার বুদ্ধিমত্তা তেমনি তাদের দৈহিক শক্তি, তেমনি তার সৌন্দর্য,... সুপুরুষ বটে মিঃ আলম.... কিন্তু আশ্চর্য, এতটুকু লোভ বা মোহ নেই তার মধ্যে। রীনা যত তাবে তত বেশি বিস্মিত হয়। নীল সাগরতলে কিভাবে গিয়ে তিনি হাজির হলেন এবং

কিভাবে তাকে শয়তান হিরন্ময়ের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। হিরন্ময় তাকে হত্যা করে নীলসাগর তলে স্বর্ণগুহায় নীলকমল বানিয়ে রাখতে চেয়েছিলো। কি ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীনই না হয়েছিলো সেদিন মিস রীনা।

ঠিক ঐ মুহূর্তে রহমান প্রবেশ করলো।

রীনা বললো–বসুন।

না, একটু কাজে বাইরে যাচ্ছি।

বসুন না, কথা আছে আপনার সঙ্গে!

রহমান এবার না বসে পারলো না।

রীনা অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলো, এবার সে উঠে বসে বললো–আচ্ছা মিঃ রহমান, একটা কথা আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করবো যদি সঠিক জবাব দেন?

করুন, সম্ভব হলে বলবো।

আচ্ছা, বলুন তো মিঃ আলম কি সাধারণ মানুষ না অন্যকিছু?

আশ্চর্য আপনার প্রশ্ন মিস রীনা?

সত্যি করে বলুন না কেন তিনি?

মিঃ আলম সম্বন্ধে আপনার এমন প্রশ্নের জন্য আমি অবাক হচ্ছি মিস রীনা।

মিঃ রহমান, আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমি তাকে যত দেখছি ততই হতবাক হচ্ছি, কারণ তার আচরণ মোটেই সাধারণ মানুষের মত নয়।

তবে কি আপনি বলতে চান তিনি অমানুষ?

না না।

তবে?

তাকে আমি দেবতার মত মনে করি। আমি হিন্দু মহিলা, আমাদের শাস্ত্রে আছে দেবতাদের নাকি কোনোরকম লোভ মোহ লালসা থাকে না। আমি মিঃ আলমকে দেখেছি–এই একটি পুরুষ যাকে আমি লোভ মোহ লালসায় আকৃষ্ট হতে দেখিনি।

এতক্ষণে রহমান কতকটা আশ্বস্ত হয়। সে মনে করেছিলো রীনা তাকে সরদার সম্বন্ধে এমন কোনো প্রশ্ন করছে যার মধ্যে আছে সর্দারের আসল পরিচয়। বললো রহমান–মিস রীনা, আপনার মনে মিঃ আলমকে নিয়ে যেমন বিস্ময় তেমিন ঠিক আমাদের মনেও। তাকে যত দেখি আমরা ততই অবাক না হয়ে পারি না। একটা গল্প বলছি শুনুন?

বলুন মিঃ রহমান?

রহমান ভালভাবে বসলো।

রীনা বললো–আপনি কোথাও যাবেন যে বললেন–কোনো অসুবিধা হবে না তো?

না, তেমন কোনো অসুবিধা হবে না, তবে একটু পরে যেতেই হবে আমাকে।

বেশ, তাই যাবেন। বলুন আপনার কি গল্পটা?

অনেকদিন আগে একবার মিঃ আলম গিয়েছিলেন ভারতে। গিয়েই তিনি জড়িয়ে পড়লেন এক রহস্যময় ব্যাপারের সঙ্গে। ভারতের এক নামী পরিবারের এক অদ্ভুত হীরকখণ্ড ছিলো। সেই হীরকের মূল্য ছিলো কোটি কোটি টাকা। এই মূল্যবান হীরকটি যখন যার হাতে আসতো তখন তার মৃত্যু ঘটতো অদ্ভুতভাবে। তবু এই হীরকের মোহ কেউ ত্যাগ করতে পারতো না। মিঃ আলম এই হীরক রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন কোনো এক কারণে।

তারপর?

তারপর মিঃ আলম নানাভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে সেই মূল্যবান হীরক উদ্ধার করলেন।

তারপর?

তিনি সেই হীরকটি হাতে পেয়ে ভাবলেন, এই হীরকের জন্য বহু জীবন বিনষ্ট হয়েছে, কাজেই এ হীরকটি হীরকের মালিক বা ওয়ারিশদের হাতে না দিয়ে ওটাকে নিজের কাছে রাখলেন এবং এক সময় সেই মূল্যবান হীরকটি তিনি ভারতের গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করলেন। ইচ্ছা করলে তিনি ঐ হীরক সচ্ছন্দে আত্নসাৎ করতে পারতেন। ভারতের হীরক নিয়ে তিনি যদি দেশে চলে আসতেন কেউ জানতো না সে হীরক কোথায় কিন্তু কোটি কোটি টাকার হীরকের প্রতিও তার মোহ নেই।

সত্যি, বিস্ময়কর মানুষ মিঃ আলম। আমি সেদিন দেখেছি হিরন্ময়ের নীল সাগরতলের বহুমূল্যবান সম্পদ পেয়েও তিনি আনন্দেউৎফুল্ল হয়ে উঠেননি, তার চোখে মুখে ফুটে উঠেনি কোনো লালসার ছাপ। কথাগুলো বলতে বলতে রীনা হারিয়ে যায় যেন কোনো অজানা অনুভূতির মধ্যে।

*

বনহুর আস্তানায় ফিরে আসতেই তার অনুচরগণ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলো–কতদিন সর্দারের সংস্পর্শে আসেনি তারা।

বনহুর প্রথমে তার অনুচরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলো। তার সমস্ত আস্তানা ঘুরে ফিরে দেখলো কোথায়। কিভাবে কাজ চলছে। কোন অনুচর কোন কাজের দায়িত্বে আছে সব সে তীক্ষ্ণভাবে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো।

নূরী বনহুরের সম্মুখে দাঁড়ায়, নিজের সাজসজ্জা কেমন আছে দেখে নিলো। সুন্দর করে চুলবিনুনি করলো, একটা ফুল গুলো বিনুনির পাশে।

প্রতীক্ষা করতে লাগলো বনহুরের জন্য নূরী।

কিন্তু বেশ বিলম্ব হচ্ছে তবু বনহুরের আসছে না দেখে বড় অভিমান হলো তার, কতদিন পর সে আস্তানায় এসেছে অথচ এখনও তার সাক্ষাৎ মিললো না। কি করছে সে যার জন্য এত বিলম্ব হচ্ছে!

নূরীর যেন তর সইছে না।

ওদিকে বনহুর তখন আস্তানার বিভিন্ন অংশ নিরীক্ষণ করে চলেছে। অনুচরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে।

নূরী তখন ছটফট করছিলো, কতক্ষণে তার পাশে আসবে হুর। এলো কিছু সময় পর।

নুরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বললো–কতদিন পর আস্তানায় ফিরে এসেছে তবু এত বিলম্ব

অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর–বিলম্ব! কিসের বিলম্ব নুরী?

একেবারে যেন কিছু বোঝোনা? জানি আমি তোমার কেউ নই আস্তানার অনুচররাই তোমার আপন জন।

নূরী, মিছেমিছি অভিমান–করছো। তুমি যেমন আমার একান্ত আপন জন তেমনি আমার অনুচররাও। কতদিন পর এলাম, তাদের সবার সংবাদ জানা আমার প্রয়োজন।

বেশ তাই করো, তবে কেন এলে এখানে?

ছিঃ রাগ করো না নূরী, জাভেদ কোথায়?

সে বনে শিকার করতে গেছে।

কার সঙ্গে?

কেন, তোমার সঙ্গে লোক লাগতো নাকি?

বনহুর বিছানায় গিয়ে বসলো, কোনো জবাব দিলো না সে নূরীর কথায়।

নূরী বললো–কি, কথা বলছে না যে?

কি আর বলবো বলল, আমি জানতাম জাভেদ কোনোদিন মানুষ হবে না।

যেমন তুমি মানুষ নও, তাই না?

হাঁ, কতকটা তাই। নূরী, তুমি কি মনে করো আমার জীবনটা বড় সুখের সুখের

না হলেও দুঃখের নয়, এ আমি জানি। চলো হাত–মুখ ধোবে চলো।

কোনো প্রয়োজন নেই, তুমি বসো নূরী।

বনহুর নূরীর আঁচল ধরে টেনে নিলো কাছে।

নূর বললো–কেউ এসে পড়লে তখন কি হবে বলোতো?

জানি এ সময়ে কেউ আসবে না, আর যাতে কেউ এ সময়ে বিরক্ত না করে, এজন্যই তো আমি আস্তানার সবার সঙ্গে দেখা করে এসেছি। দেখলে আমি কত বুদ্ধিমান? কথাটা বলে হাসে বনহুর।

নূরী স্বামীর বাহুবন্ধনে নিজেকে বিলিয়ে দেয়।

নুরীর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলে বনহুর–কেমন ছিলে কই বললে না তো?

তুমি না থাকলে আমি কেমন থাকি তা তুমি জানো না বুঝি? হুর, তুমি সেই গেলে, এরপর একটিবার এলে না। একটা সংবাদও দিলে না কেমন ছিলে?

অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম নূরী।

কবে তুমি কম ব্যস্ত থাকো। আচ্ছা, আশার উদ্ধার ব্যাপার কিছু বললে না তো? সত্যি, ওর কথা আমি ভুলতেই পারি না। জানো হুর, আশাকে আমার খুব ভালো লাগে।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

বলো তো ওকে তোমার এত ভালো লাগে কেন?

সে শুধু তোমাকেই নয়, সে আমাকেও দারুণ বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলো। সেদিন সে যদি আমাকে পাষণ্ড নরপশু ক্যাপ্টেনের কবল থেকে উদ্ধার না করতো, তাহলে আজ হয়তো তোমার বাহুতে স্থান পেতাম না হুর!

ঠিক বলেছো নূরী, আশার কাছে আমি বড় ঋণী। সে ঋণ কোনোদিন পরিশোধ করতে পারবো না।

আশা এখন কোথায়?

সে তার বাবা মনসুর ডাকুর আস্তানায়।

তবে কি আশা এখনও দস্যুতা করে?

তা ঠিক জানি না, তবে প্রয়োজনবোধে হয়তো করে।

আচ্ছা হুর, আশার আরও নাকি একটা নাম আছে? তুমি কি তার আসল নাম জানো?

জানি।

বলো না?

তার আসল নাম ইরানী, তবে সে দস্যুতা করতো আশা নামে। এ ছাড়া দরকার হলে সে আরও নাম ধারণ করে। যাক, আশার কথা এখন থাক।

না, আরও বলো? আশার উদ্ধার কাহিনী আমাকে তুমি শোনাও হুর।

সে অনেক বড় ঘটনা। বলতে অনেক সময় লাগবে, বলবো একদিন।

সত্যি, আশা বড় ভালো।

নূরী, আজ তুমি আশাকে নিয়ে বড় মেতে উঠলে, বলতো ব্যাপারখানা কি?

কায়েস বলছিলো আশা তোমাকে নিজের প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

তাতে কি হয়েছে, আশা যদি ভালোবাসে বেশ তো।

সত্যি তুমি এতে আনন্দ পাও?

মোটেই না।

কেন?

তোমার কেনর জবাব আজ দেবো না।

বনহুর আর নূরী নানা কথায় তলিয়ে যায়।

এক সময় ফিরে আসে জাভেদ। মস্তবড় একটা হরিণ শিকার করেছে সে আজ। নিজেই নিহত হরিণটা কাঁধে করে এসেছে।

মায়ের দরজায় এসে ডাকে জাভেদ–মাম্মি মাম্মি....... এসো এসো.....

বনহুর আর নূরী তাদের গুহা থেকে বেরিয়ে আসে।

বনহুর অবাক হয়ে যায় জাভেদের কাঁধে বিরাট একটা হরিণ দেখে।

নূরী কিছু বলবার পূর্বেই জাভেদ বনহুরকে দেখেই তীরবিদ্ধ হরিণটাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে পিতাকে জড়িয়ে ধরে–আব্বু তুমি এসেছে।

বনহুর জাভেদের কপাল থেকে সস্নেহে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে বলে–জাভেদ, হরিণটাকে বধ করে তুমি ভালো কাজ করোনি!

আব্বু!

হাঁ, জাভেদ, কারণ হরিণটা তোমারই সাথী। জানো, আমরা সবাই এক বনের জীব! আমি তুমি তোমাদের আম্মা এবং বনের হিংস্র জীবজন্তু সবাই আমরা প্রতিবেশী। ছিঃ অমন কাজ আর যেন করো না। একই বনে বাস করতে হয়, ওরা যদি তোমাকে দেখে ভয় পায় তাহলে কাকে নিয়ে এ জঙ্গলে বাস করবে বলো তো!

নূরী বলে উঠলো–জাভেদ এতবড় একটা হরিণ শিকার করে এনেছে তুমি খুশি হবে–তা না, ওকে বকছো?

না না, বকবো কেন, সত্যি যা বলছি। হরিণ নিরীহ জীব, ওকে মারতে নেই বাপু।

বেশ, হরিণ আর মারবো না, হিংস্র জীব পেলে কিন্তু ক্ষমা করবে না তাকে।

বেশ, তাই হবে। হেসে বললো বনহুর।

জাভেদ খুশি হয়ে চলে গেলো।

নূরী বললো–ছোটবেলায় তোমাকে তো দেখেছি কত দুষ্ট ছিলে তুমি!

মনে আছে তোমার?

খুব আছে।

আমার কিন্তু কিছু মনে নেই কি করেছি আমি? চলো ভিতরে চলো নূরী, বসে বসে গল্প করা যাবে।

তুমি স্থির হয়ে বসতে পারবে?

নিশ্চয়ই পারবো।

সত্যি, এবার তুমি অনেক পাল্টে গেছ।

তাই নাকি?

হাঁ, তোমাকে আজ আমি নতুন রূপে দেখছি হুর। তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। সে কথা মিথ্যা নয়, আমি পরম নিশ্চিন্ত না হলেও বেশ নিশ্চিন্ত, কারণ তোমাকে পরে বলবো নূরী। বনহুর আর নূরী গুহামধ্যে প্রবেশ করে।

*

গভীর রাতে অশ্বপদশব্দে ঘুম ভেঙে গেলো মনিরার। এ অশ্বপদশব্দ তার অতি পরিচিত। নিদ্রাজড়িত চোখ দুটো রগড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এলো জানালার পাশে।

মুক্ত জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে। বেশ কিছুক্ষণ হলো অশ্বপদশব্দ মিশে গেছে কিন্তু মনিরার কানে এখনও লেগে আছে সেই শব্দের অনুভূতি। কেন আসছে না সে এতক্ষণ,–তবে কি তার শুনবার ভুল? হয়তো স্বপ্ন দেখেছে, নয় অন্য কোনো অশ্বপদশব্দ তার কানে তাজের খুরের প্রতিধ্বনি তুলেছে।

মনিরা যেমনি ফিরে দাঁড়াতে যাবে, অমনি কে যেন পেছন থেকে তার চোখ দুটো ধরে ফেললো।

মনিরা হাতের উপর হাত রেখেই বুঝতে পারলো এ হাত কার। বললো সে– এখনও তোমার দুষ্টামি গেল না।

ও, তাহলে চিনতে পেরেছে? কথাটা বলে বনহুর মনিরার চোখ দুটো থেকে হাত সরিয়ে নিলো।

মনিরা ফিরে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে–কেন এলে বলো তো?

যদি বলি মনের টানে।

তোমার আবার মনের টান আছে নাকি?

মনিরা, সে যদি বুঝতো তাহলে...

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা–তাহলে কি করতে বলো?

সত্যি মনিরা, তোমরা সবাই আমার উপর রাগ করো। মাঝে মাঝে আমার নিজেরও রাগ হয় নিজের উপর, ভাবি এবার থেকে সংসারী হবো। তুমি তো জানো কতবার এ ব্যাপারে চেষ্টাও নিয়েছি, কিন্তু......

সংসারী হতে পারোনি, এই তো?

আমাকে ক্ষমা করো মনিরা।

রেখে দাও তোমার নেকামি। যদি এমনি করে চলেই যাবে, তাহলে বিয়ে না করলেই পারতে?

বড় পুরোন কথা এটা মনিরা।

তবু জবাব দিতে হবে তোমাকে?

তোমার প্রশ্নের জবাব দেওয়া অত্যন্ত কঠিন মনিরা। অন্ততঃ আজকের মত তুমি আমাকে......

ক্ষমা করবো, তাই না?

হাঁ, হাঁ, মনিরা। বনহুর মনিরার হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো। মনিরা স্বামীর মুখোভাবে লক্ষ্য করে আর কঠিন হতে পারলো না, একটু হেসে বললো–যাও, এবার তোমাকে ক্ষমা করলাম।

জানি তুমি আমাকে ক্ষমা না করে পারবে না। লক্ষীটি, আমি সত্যি অপরাধী, তবু জানি না কেন এমন হয় বা কেন এমন করি।

বল এবার কোথায় গিয়েছিলে, চন্দ্রপৃষ্ঠে না ভূগর্ভে

হাঁ, ইচ্ছে আছে একবার চন্দ্রপৃষ্ঠে যাবে। তবে এবার যেখানে গিয়েছিলাম সেটা চন্দ্রপৃষ্ঠ নয় বা ভূগর্ভ নয়, নীল সাগরতলে গিয়েছিলাম।

নীল সাগরতলে!

হাঁ মনিরা।

বল তা কেমন?

এখন নয়, পরে বলবো। এসো– বনহুর মনিরাকে সঙ্গে করে খাটে এসে বসলো।

মনিরা বললো–এমনি করে আর কতদিন কাটবে বলো? আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না। নুর বিদেশ যাওয়ার পর থেকে আমার কি মনে হয় জানো? বড় একা একা লাগে আমার।

জানি মনিরা।

জানো তুমি?

আমি কি মানুষ নই? সব বুঝি মনিরা।

হা মনিরা, আমি বড় অপরাধী। বনহুর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দেয়।

মনিরা স্বমীর বুকে মাথা রেখে, বলে–ওগো, এমনি করে তুমি থাকতে পারো না? কত সাধ হয় তোমাকে সব সময় পাশে পাবো.... বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মনিরার কন্ঠস্বর।

বনহুর মনিরার চিবুকটা তুলে ধরে–মনিরা, ঠিক তোমার মতই আমারও ইচ্ছা হয় কিন্তু কেন যেমন সব ভুলে যাই। অবশ্য এটা আমার নিজের অপরাধ,….

চুপ করো, আমি সব জানি।

মনিরা, আজ তোমাকে একটা কথা বলবো যা না বললেই নয়। তবে একটা কথা, তুমি সব শুনে আমার উপর রাগ করবে না তো?

না, তেমন কথা আমি শুনতে চাই না।

মনিরা!

হাঁ।

কিন্তু না বললেই নয়।

চুপ করো, পরে শুনবো। চলো, মামীমা তোমার চিন্তায় বড় অস্থির আছেন

হাঁ, চলো।

বনহুর আর মনিরা মায়ের ঘরে প্রবেশ করলো।

মরিয়ম বেগম ঘুমাচ্ছেন। হয়তো বা স্বপ্ন দেখছেন তার সন্তানের।

বনহুর মায়ের শিয়রে দাঁড়িয়ে ডাকলো–মা, মাগো!

মরিয়ম বেগম সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠলেন, তার ঘুম তেমন গভীর ছিলো না। নানা চিন্তায় মন তার সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতো, তাই ঘুমালেও মন তার সচেতন থাকতো।

বনহুরের কণ্ঠস্বর কানে যেতেই জেগে উঠলেন তিনি। ধড় মড় করে বিছানায় উঠে বসে তাকালো বনহুর আর মনিরার দিকে।

মনিরা বললো–মামীমা, ও এসেছে।

বনহুর মায়ের পাশে বসে পড়ে মাকে দক্ষিণ হাতে জড়িয়ে ধরে বললো–মা, কেমন আছো?

ভালোই আছি বাবা, তুই কেমন ছিলি?

ভালো। তুমি কিন্তু বড় রোগা হয়ে গেছ?

মনিরা বলে উঠে–রোগা হবে না, সব সময় উনি তোমার কথা ভাবেন।

মিছেমিছি ভাবো মা! আমি যেখানেই থাকি, মনে রেখে তোমার দোয়া আছে আমার সঙ্গে।

ওরে, তুই বুঝবিনে কত ভাবনা আমার।

মনিরা বলে–তোমরা মা–ছেলে কথা বলো, আমি কিছু খাবার আনি। বেরিয়ে যায় মনিরা।

বনহুর আর মরিয়ম বেগমে নানারকম আলাপ আলোচনা চলে।

এক সময় রাশিকৃত খাবার নিয়ে হাজির হয় মনিরা, স্বামীর সম্মুখে খাবারগুলো সাজিয়ে রেখে বলে–নাও, খেয়ে নাও।

বনহুর অবাক কণ্ঠে বলে–রাত দুপুরে এত খাবার কোথায় পেলে মনিরা?

তুমি জানো না, মামীমা বোজ তোমার প্রতীক্ষায় বসে থাকেন একগাদা খাবার নিয়ে। এসব মামীমা রোজ নিজে তৈরি করেন।

একি মা, তুমি সেই আগের মত এখনও…

মামীমা কি বলেন জানো, উনি বলেন হঠাৎ কখন আমার মনির আসবে, এলে তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে পারবো না, তাই এসব করে রাখছি, এলে খাবে তাই আজ তার এ আশা পূর্ণ হয়েছে। খাও।

বনহুর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে যেমনি খাবার মুখে তুলে দিতে গেছে, অমনি রিভলভার হাতে মিঃ জাফরী ও আরও দু’জন পুলিশ এসে দাঁড়ালেন তার সম্মুখে।

একসঙ্গে মরিয়ম বেগম এবং মনিরা বিস্ময়ে চমকে উঠে অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন।

মিঃ জাফরী বলে উঠলেন–বনহুর, একচুল নড়তে চেষ্টা করো না।

মিঃ জাফরীর হাতের রিভলভারের দিকে তাকিয়ে দেখে নিলো বনহুর, তারপর তার চোখে চোখ রেখে দু'হাত উপরে তুলে উঠে দাঁড়ালো।

মরিয়ম বেগম আর্তনাদ করে বললেন–একি করছেন আপনারা?

মিঃ জাফরীই বলে উঠলেন–বহুদিন পর ওকে আমরা চৌধুরী বাড়িতে পেয়েছি।

আপনারা ওকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করছেন। আমার মনি নিরপরাধ বলে প্রায় কেঁদে ফেললেন মরিয়ম বেগম।

মিঃ জাফরী বললেন, মায়ের কাছে সন্তান সব সময় নিরপরাধই হয়। মিসেস চৌধুরী, আপনি জানেন না ওকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমাদের পুলিশ বাহিনী কতদিন ধরে চৌধুরী বাড়ি পাহারা দিয়ে আসছে, কত ঝড় বৃষ্টি মাথায় করে পুলিশ চৌধুরী বাড়ির ঝোঁপঝাড়ে লুকিয়ে ছিলো। আজ সুযোগ এসেছে–মিঃ জাফরী তার সঙ্গীদের ইংগিত করলেন বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেবার জন্য।

ওরা সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করলো।

মনিরা চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে স্বামীর মুখের দিকে। একটি কথা সে বলতে পারছে না বা বলছে না।

মরিয়ম বেগম আঁচলে চোখ ঢেকে কেঁদে ফেললেন।

বনহুর মা এবং মনিরার দিকে তাকিয়ে মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো–চলুন এবার।

মিঃ জাফরী বনহুরকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

তাদের পিছনে কয়েকজন পুলিশ, সবার হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র।

বনহুরকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়লো।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির মুখে, চিৎকার করে ডাকলেন–মনি, ওরে বাপ আমার।

ততক্ষণে বনহুরকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে বসেছেন মিঃ জাফরী।

মাঝের পুলিশ ভ্যানে মিঃ জাফরী বনহুরকে নিয়ে বসলেন। তাদের দুপাশে এবং পিছনে চারজন সশস্ত্র পুলিশ অস্ত্র বাগিয়ে ধরে বসলো। সম্মুখে এবং পিছনে পুলিশ ভ্যান।

রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চললো পুলিশ ভ্যানগুলো। ওরা যেন পূর্ব হতেই জানতো আজ আসবে বনহুর, তাই তারা সজাগ প্রহরায় ছিলো।

বনহুরকে বন্দী করে নিয়ে চললো।

তাজ ফিরে চললো আস্তানায়।

তাজ যখন শূন্যপৃষ্ঠে ফিরে এলো তখন নুরী এবং বনহুরের অনুচররা ভীষণভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লো।

সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো, ব্যাপার কি, তাজ শূনপৃষ্ঠে ফিরে এসেছে– সর্দার গেলো কোথায়!

তক্ষুণি ওয়্যারলেসে শহরের আস্তানায় জানিয়ে দেওয়া হলো।

বনহুরের অনুচরগণ যে যেখানে ছিলো সবাই সজাগ হয়ে উঠলো। দরবারকক্ষে, তারা একত্রিত হলো, কেমন করে সর্দারকে উদ্ধার করা যায়। শহর থেকে বনহুরের অনুচরগণ জানালো, সর্দারকে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, সে নিজের হাতে তাকে জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে, নিজের হাতে তাকে অস্ত্র তুলে দিয়ে পাঠিয়েছে। অথচ সে আর ফিরে এলো না, ব্যথায় মুষড়ে পড়লো নূরী।

নাসরিন এসে অনেক বুঝাতে লাগলো।

নূরী ফুল্লরাকে কোলে কাছে টেনে নিয়ে বললো–ফুল্লরা, তুই বুঝবি না মা, আমাদের সর্দারকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

বলো কি মাম্মি?

ফুল্লরা নূরীকে মাম্মি বলতো, কারণ জাভেদ তাকে মাম্মি বলতে, এ কারণেই সেও ঐ ডাক শিখে নিয়েছিলো।

নাসরিনকে ফুল্লরা আম্মু বলতো।

ফুল্লরা ছোট হাতখানাকে মুষ্টিবদ্ধ করে বলে–মাম্মি, আমি যদি বড় হতাম এক্ষুণি গিয়ে পুলিশদের হাত থেকে সর্দারকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসতাম।

আগে বড় হও ফুল্লরা, তারপর তুমি পুলিশকে শায়েস্তা করো। বারুদ্ধ কণ্ঠে বললো নূরী।

জাভেদ যখন শুনলো তখন সে দাঁতে দাঁত পিষে বললো–আমার আব্বকে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করেছে। আমি এক্ষুণি যাবো আলুকে নিয়ে আসবো তাদের গাড়ি থেকে।

নূরী জাভেদকে কাছে টেনে নিয়ে বলে–বাবা, তুমি ছোট্ট ঘোড়ায় চেপে এতটা পথ যেতে পারবে না, তাছাড়া পুলিশের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

কে বললো আমি পুলিশের সঙ্গে পারবো না মাম্মি?

আমি বলছি বাবা।

কেন পারবো না।

তারা বড় এবং তাদের কাছে প্রচুর অস্ত্র আছে। তুমি তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

মাম্মি তুমি বোঝেনা, আমি ঠিক পারবো। আমাকে একখানা রাইফেল দাও!

রাইফেল না পারি তীরধুন আছে আমার। কোনো কথা না শুনে বেরিয়ে যায় জাভেদ সে সবার অলক্ষ্যে তীরধনু নিয়ে এসে দাঁড়ায় অশ্বশালায়। তাজ অনেক

উঁচু ঘোড়া, তাই তাজের পিঠে চাপতে পারে না। অপর একটা ঘোড়া সে বের করে আনে, তারপর ঘোড়াটাকে সে টেনে নিয়ে আসে একটু উঁচু পাথরখণ্ডের পাশে। এবার ঘোড়ার পিঠে চাপতে বিলম্ব হয় না তার।

পিঠে তীরধনু বেঁধে নিয়ে ঘোড়ার কেশর চেপে ধরে সে।

ঘোড়া ছুটতে শুরু করে।

একবার জাভেদ রহমানের সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে শহরের আস্তানায় এসেছিলো, পথ তার তাই চেনাই ছিলো। রহমান তাকে অবসর সময়ে শহরে বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়ে নিয়ে ছিলো। কোনটা শহরের সবচেয়ে বড় হোটেল, কোনটা বড় হোটেল, কোনটা পুলিশ অফিস, কোনটা হাঙ্গেরী কারাগর–যেখানে তার আব্বকে আটক করে রেখেছিলো। সেই বিরাট আকাশচুম্বী প্রাচীর ডিংগিয়ে তার আলু চলে এসেছিলো হাঙ্গেরীর বাইরে। সব কথা রহমানের কাছে শুনেছিলো জাভেদ।

অশ্বপৃষ্ঠে বসে জাভেদ চলে এলো একেবারে হাঙ্গেরী কারাগারের নিকটে। পথে কেউ তাকে বাধা দিলো না বরং সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ছোট্ট একটা সুন্দর ফুটফুটে বালক ঘোড়ায় চেপে রাজপথ বেয়ে চলেছে–সত্যি বিস্ময়কর। তাও আবার লাগামবিহীন, দু'হাতের মুঠায় চেপে ধরে আছে অশ্বের কাঁধের লোমগুলো।

জাভেদের বলিষ্ঠ সুন্দর মুখে দৃঢ়তার আভাস ফুটে উঠেছে। সে হাঙ্গেরী কারাগারের অদূরে এসে একটা বিরাট গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো কিভাবে কারাগার থেকে তার আবুকে বের করে আনবে। সে দেখলো বিরাটকার লৌহফটক। ফটকে রাইফেলধারী চারজন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। শুধু কি ফটকে, হাঙ্গেরী কারাগারে চারিপাশ ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স। জাভেদ একটু চিন্তিত হলো, কি ভাবে এতগুলোকে সে খতম করবে–দু'চারজন হলে সে দেখে নিতে কিন্তু এতগুলো অস্ত্রধারী পুলিশ.... জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে বসে ভাবছে। এসেছে যখন তখন আব্বকে উদ্ধার করেই সে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই এবারও আলুকে ঐ প্রাচীরের অভ্যন্তরে বন্দী করে রেখেছে।

জাভেদ ঘোড়া নিয়ে হাঙ্গেরীর অদূরে একটা বড় টিলার আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। জাভেদের ঘোড়াটাও ছিলো তাজের মতই চতুর, জাভেদ তাকে যেভাবে চালনা

করছিলো ঠিক সেইভাবে সে কাজ করছিলো।

জাভেদ অশ্ব নিয়ে আড়ালে লুকিয়ে সেখান থেকে তীর চালালো। তীর চালনায় জাভেদ অত্যন্ত দক্ষ। তার তীর এসে বিদ্ধ হলো হাঙ্গেরী কারাগারের একজন পুলিশ প্রহরীর বুকে।

আর্তনাদ করে প্রহরীটা লুটিয়ে পড়লো হাঙ্গেরী কারাগারের সেই ফটকের ধারে।

সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে উঠলো অন্য প্রহরীরা।

কিন্তু ততক্ষণে আরও একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো আর একজন প্রহরীর বুকে।

প্রহরীরা চঞ্চল হয়ে উঠলো।

একটার পর একটা তীর এসে বিদ্ধ হচ্ছে হাঙ্গেরী কারাগারের প্রহরীদের কারও বুকে, কারও পিঠে, কারও গলায় বা চোখে।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠে বসে নিপুণভাবে তীর চালিয়ে পাঁচ ছয় জন প্রহরীকে নিহত করে ফেললো।

কারাগারের ফটকে কেউ দাঁড়াতে সাহসী হলো না, সবাই ছত্রভঙ্গ হয়ে আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

কারাগারের ফটকে বিপদসংকেত ঘন্টা বেজে উঠলো।

বিপদ সংকেত ঘন্টা শোনামাত্র চারিদিক থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী ছুটে এলো, এগিয়ে এলো পুলিশ ভ্যান।

ততক্ষণে জাভেদ তার অশ্ব নিয়ে পালাতে শুরু করেছে।

অশ্বপদশব্দ শোনামাত্র পুলিশ বাহিনীর নজর সেদিকে গিয়ে পড়লো। পুলিশ বাহিনী পুলিশ ভ্যান নিয়ে ছুটলো, কিন্তু জাভেদ তখন অশ্ব নিয়ে পর্বতের গায়ে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ছুটতে শুরু করেছে।

পুলিশ বাহিনী তাকে দেখতে পায় না, শুধু তাদের কানে ভেসে আসছে অশ্বপদশব্দ।

পর্বতের উপরে কিছুটা পথ উঠে গোড়া থেকে নেমে পড়লো জাভেদ। সেখানে থেকে সে সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। জাভেদ মুহূর্ত বিলম্ব না করে ধনুকে তীর সংযোগ করলো।

তীর এসে বিদ্ধ হলো পুলিশ ভ্যানের উপরে অস্ত্রহাতে দণ্ডায়মান এক পুলিশের বুকে।

আর্তনাদ করে ঢলে পড়লো পুলিশটা ভ্যানের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো আর একজন পুলিশের কাঁধে। সেও তীব্র আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো।

পুলিশ অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশগণ ভ্যান ছেড়ে নেমে পড়লো। তারা আত্মগোপন করে ধীরে ধীরে পর্বতের উপরে অগ্রসর হলো।

সর্বাগ্রে চলেছেন পুলিশ প্রধান।

তার চোখেমুখে ভীষণ এক আতঙ্কের ছাপ বিদ্যমান। দস্যু বনহুরকে মিঃ জাফরী কৌশলে গ্রেপ্তার করেছেন এবং তাকে হাঙ্গেরী কারাগারে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে আটক করে রাখা হয়েছে।

হাঙ্গেরী কারাগারে এই কারাকক্ষটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে, একটা পিপীলিকাও কোনো পথে– সেই কারাকক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। দেয়ালটা কঠিন ইস্পাত দিয়ে তৈরি। তাছাড়াও কারাগারের মধ্যেও ঐ কারাকক্ষের চারপাশ ঘিরে প্রহরা দিচ্ছে অসংখ্য যোয়ান, তারা এক একজন বিশ্বস্ত সৈনিক।

কিন্তু এ কে, যে অশ্ব নিয়ে হাঙ্গেরী কারাগারের প্রহরীদের উপর তীর নিক্ষেপ করে চলেছে? তাকে তারা একনজর দেখতেও পারলো না।

পুলিশ অধিনায়ক চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে পর্বতের উপরে লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু কোন্ দিক থেকে তীর আসছে তিনি কিছুতেই ধরতে পারছেন না।

পুলিশ অধিনায়কের নির্দেশমত ছড়িয়ে পড়লো পুলিশ বাহিনী। তারা অস্ত্র বাগিয়ে নিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগুতে লাগলো। তাদের চোখেমুখে একটা ভীষণ উৎকণ্ঠ, না জানি কোন মুহূর্তে কার বুকে এসে তীর বিদ্ধ হবে!

পুলিশ বাহিনীর লোকেরা পর্বতের গা বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো।

কিন্তু তীর নিক্ষেপ অবিরত চলেছে।

পুলিশ প্রহরী এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মিলে দশ বারো জন তীরবিদ্ধ হয়ে ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে।

কে সে তীর নিক্ষেপকারী যে এভাবে তীর চালনা করে চলেছে?

পুলিশ অধিনায়ক পুলিশ বাহিনীকে ফাঁকা আওয়াজ করতে নির্দেশ দিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন কোন দিক থেকে তীর আসছে।

পুনরায় একটা তীর এসে বিদ্ধ হয়রা একজন পুলিশের পিঠে।

পুলিশ বাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে পর্বতের গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তারা অবিরত গুলী ছুড়ছে আর অগ্রসর হচ্ছে।

জাভেদ অশ্বপৃষ্ঠ ত্যাগ করেছিলো অনেকক্ষণ, সে পর্বতের আড়ালে আত্মগোপন করে দক্ষ তীরন্দাজের মত তীর চালাচ্ছে। কখনও এখানে, কখনও সেখানে, কখনও বা উবু হয়ে,কখনও হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো এবং তীর চালাচ্ছিলো।

আরও একজন পুলিশ প্রাণ হারালো।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো একজন পুলিশ–স্যার, ঐ দেখুন..

সঙ্গে সঙ্গে তার কণ্ঠ থেকে গেলো, একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো তার কণ্ঠদেশে। আর্তনাদ করার মত সময় পেলো না সে, গড়িয়ে পড়লো পর্বতের গা থেকে নিচে।

পুলিশ অধিনায়কও দেখতে পেয়েছেন তীর চালককে। তার চোখে–মুখে ফুটে উঠে একটা বিস্ময়কর ভাবতীর চালনা করছে একটা ছোট্ট বালক!

অপর একজন পুলিশ রাইফেল তুলে তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে গেলো।

পুলিশ অধিনায়ক তাকে বললেন–গুলী ছুড়ো না, ওকে জীবন্ত পাকড়াও করতে হবে। আশ্চর্য, এতক্ষণ আমরা একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে যুদ্ধ করছি!

একজন পুলিশ অফিসার বলে উঠলেন–স্যার, আশ্চর্যই বটে। কিন্তু ছোট্ট ছেলে হলেও সে আমাদের বেশ সংখ্যক পুলিশকে হত্যা করেছ।

হাঁ, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করবো। পুলিশপ্রধান চোখে দূরবীক্ষণ লাগিয়ে দেখছেন।

তীর আর আসছে না।

পুলিশপ্রধান বুঝতে পারেন তীর শেষ হয়ে গেছে, তাই সে আর তীর ছুঁড়তে পারছে না। পুলিশবাহিনীকে তিনি গুলী ছুঁড়তে বারণ করে দেন এবং নিজেও পুলিশবাহিনীর সঙ্গে উপরে উঠতে থাকেন।

জাভেদ তখন অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসার জন্য অশ্বকে হাঁটু গেড়ে বসার ইংগিত করছিলো।

অশ্বটা জাভেদের ইংগিত বুঝতে পেরে সম্মুখের হাঁটু দুটি ভাঁজ করে নিচু হয়। জাভেদ যেমনি অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে বসতে যাবে, অমনি তাকে চারপাশ থেকে পুলিশ বাহিনী ঘিরে ফেললো।

সবার চোখেই বিস্ময়, এতটুকু ছেলে এতক্ষণ তাদের এভাবে নাকানি চুবানি খাওয়ালো!

জাভেদকে পুলিশ অধিনায়ক পাকড়াও করে সোজা নিয়ে এলেন কান্দাই পুলিশ অফিসে। আর নিয়ে এলেন এগারোটা তীরবিদ্ধ নিহত পুলিশকে।

মুহূর্তে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো সমস্ত কান্দাই শহরে। পুলিশ অফিস লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান সবাই এসে জড়ো হলেন। চারিদিক থেকে ক্যামেরাম্যান, সাংবাদিকগণ জাভেদের ছবি নিচ্ছেন, তার সঙ্গে ছবি নিচ্ছেন নিহত পুলিশ বাহিনীর যোয়ানদের।

সবার চোখেমুখেই বিস্ময়, এতটুকু ছেলে কিভাবে এতগুলো সশস্ত্র পুলিশকে খতম করেছে! সবার মনেই নানা প্রশ্ন কিন্তু কে দেবে জবাব! জাভেদ পাকড়াও হবার পর একটা কথাও বললো না। সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চোখেমুখে নেই এতটুকু ভীতির ছাপ। মাঝে মাঝে সে চোখ তুলে দেখে নিচ্ছিলো সবাইকে, কিন্তু মুখে একটা শব্দও জাভেদ উচ্চারণ করেনি একটাবারের জন্য।

পুলিশপ্রধানগণ তাকে নানা প্রশ্ন করে চললেন কিন্তু আশ্চর্য সে টু শব্দ করলো না।

পরদিন কান্দাই সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হলো এই বিস্ময়কর সংবাদ। সঙ্গে বেরুলো জাভেদের ছবি।

এক সময় সংবাদপত্র মনিরার হাতে এসে পড়লো।

সংবাদ পড়ে মনিরা বিস্ময়ে হতবাক হলো। সংবাদপত্রে যা লিখেছে তার সার কথা হলো, দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরীকারাগারে আটক রাখার পর হঠাৎ এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একটা ছোট্ট বালক অশ্বপৃষ্ঠে চেপে হাঙ্গেরী কারাগারের প্রহরীদের উপর হামলা চালায় এবং বেশ কিছুসংখ্যক প্রহরী পুলিশকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করে। তাকে পাকড়াও করতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছে। সর্বমোট এগারোটা পুলিশকে নিহত করার পর তাকে কান্দাই পর্বতের কোনো এক জায়গা থেকে কৌশলে গ্রেপ্তার করা হয়।

মনিরার বিস্ময় চরমে উঠলো, বিশেষ কর বনহুরের আটকের সঙ্গে এই বালকের কি সম্বন্ধ? সে কেন হাঙ্গেরী কারাগারের প্রহরীদের উপর হামলা চালালো? কি উদ্দেশ্য ছিলো তার? সবচেয়ে বেশি অবাক হলো মনিরা বালকটার ছবি দেখে–নূরের চেহারার সঙ্গে যেন হুবহু মিল আছে। কে এই বালক?

মনিরা বারবার সংবাদপত্রের ছবিখানা চোখের সামনে তুল ধরে দেখতে লাগলো। কেমন যেন সব ঘঘালাটে লাগছে তার কাছে। বনহুর বন্দী হবার সঙ্গে এর কি যোগাযোগ থাকতে পারে? তাছাড়া তার সন্তান নূরের চেহারার সঙ্গে কি করে এমন নিখুঁত মিল হতে পারে?

কি করে এমন হলো....... মনিরা আপন মনে কথাটা উচ্চারণ করে ডাকলো–সরকার চাচা! সরকার চাচা.....

সরকার সাহেব নিচেই ছিলেন, তাড়াতাড়ি উঠে এলেন–আমাকে ডাকছো মা?

হা সরকার চাচা।

বলোমা?

সংবাদপত্র মনিরার হাতেই ছিলো, সে সরকার সাহেবের হাতে সংবাদপত্র দিয়ে বললো–পড়ে দেখুন।

মনিরা সংবাদপত্রের যে অংশটা আংগুল দিয়ে দেখিয়ে কথাটা বললো, সরকার সাহেব সেই অংশে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললেন–আমি পড়েছি মা!

কিছু বুঝতে পারলেন?

না, আমিও তোমারই মত অবাক হয়েছি। মনির বন্দী হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ছেলে হাঙ্গেরী কারাগারের উপর হামলা চালিয়েছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কারাগার হাঙ্গেরী….. কি করে ক্ষুদ্র বালক এমন সাহস পেলো?

সরকার চাচা, তার চেয়ে বিস্ময়কর হলো এই দুর্দান্ত ছেলেটার চেহারা আমার নূরের সঙ্গে একেবারে মিলে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয় মা, এ ছবি দেখলে আমার মনে পড়ছে সেই ছবিটার কথা–আমাদের মনির বাবার কথা। ছোটবেলায় মনির চোখেমুখে ছিলো এমনি একটা বলিষ্ঠতার ছাপ, তেজোদ্দীপ্ত ভাব।

মনিরা ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায়–কে এই ছেলেটা যার সঙ্গে তার স্বামীর চেহারার মিল রয়েছে, মিল রয়েছে তার নূরের। তাছাড়াও ঐ ছেলেটি এসেছিলো মনিরকে উদ্ধার করতে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে। কতবড় সাহস তার যার জন্য সে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছে। শুধু তাই নয়, নিহত করেছে কতগুলো পুলিশকে।

*

সমস্ত কান্দাই জঙ্গলে তন্ন তন্ন করে খোঁজ করা হলো কিন্তু কোথাও জাভেদকে খুঁজে পাওয়া গেল না। যারা জাভেদের সন্ধানে গিয়েছিলো, তারা সবাই এক এক

করে ফিরে এলো।

নূরী তো কান্নায় ভেঙে পড়েছে, তাকে কেউ প্রবোধ দিতে পারছে না। নূরী বলছে, জাভেদ হারিয়ে যাবার ছেলে নয়, নিশ্চয়ই তাকে কোনো হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু ঘোড়াটা কোথায়?

জাভেদের নিখোঁজের সঙ্গে নিশ্চয়ই অশ্বটার যোগাযোগ আছে। জাভেদ তাহলে অশ্বপৃষ্ঠ চেপে উধাও হয়েছে। তাকে যদি হিংস্র জন্তু খাবে তাহলে অশ্বটা কোথায় গেলো? এরকম নানা প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগলো নূরী এবং আস্তানার অন্যদের মনে।

সকাল গেলো।

বিকেল হলো, তবু ফিরে এলো না জাভেদ।

আস্তানার সবার মন বিষণ্ন মলিন। নূরী তো ব্যাকুল হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছে। কেউ তাকে নিশ্চুপ করাতে পারছে না।

দু'দিন দু'রাত কেটে গেলো।

একেতো নূরী এবং আস্তানার সবাই সর্দারের গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়ে দূর্ভাবনায় কাল কাটাচ্ছে, তারপর জাভেদ গেলো কোথায়–সে ছোট্ট বালক, দিনরাত বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, হরিণ কিংবা বাঘ–ভালুক শিকার করে। এ বন ছাড়া সে কোথাও যায়নি বা যেতে জানে না।

দু'দিন দু'রাত কেটে গেলো অথচ যখন জাভেদের কোনো সন্ধান হলো না তখন নূরীই অশ্ব নিয়ে বেরুলো তার খোঁজে। কিন্তু বিফল হয়ে ফিরতে হলো তাকে।

সন্ধ্যায় আস্তানায় ফিরে দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো নূরী।

নাসরিন এসে অনেক বোঝাতে লাগলো, কিন্তু নূরী শুধু কাঁদতেই লাগলো, সে কান্না থামতেই চায় না।

ফুল্লরার চোখেও পানি।

সে সব সময় জাভেদের সঙ্গে খেলা করতো, বেড়াতো–শিকারে ওর সঙ্গে যেতো। আজ দু'দিন জাভেদকে হারিয়ে ফুল্লরার মনেও স্বস্তি নেই।

সবাই যখন দুশ্চিন্তায় অস্থির এমনি সময় ফিরে এলো জাভেদের অশ্বটা। শূন্যপিঠে তাজ যেমন ফিরে এসেছিলো তেমনি ফিরে এলো জাভেদের অশ্ব।

সবাই ঘিরে ধরলো জাভেদের অশ্বটাকে।

নূরী ছুটে এসে জাড়িয়ে ধরলো জাভেদের অশ্বের গলা, কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করলো–আমার জাভেদকে কোথায় রেখে এলে? ওরে বল কোথায় আমার জাভেদ

জাভেদের সংবাদ অশ্ব জানে তবু সে নীরব, কি করে বলবে তাকে পুলিশ বাহিনী ধরে নিয়ে গেছে।

নূরী ছুটে এলা আস্তানার অভ্যন্তরে। দ্রুতহস্তে সে পরে নিলো পুরুষের পোশাক, তারপর কোমরের বেল্টে রিভলভার খুঁজে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কারও মানা সে শুনলো না।

তাজের পিঠে চেপে বেরিয়ে পড়লো নূর।

তীরবেগে তাজ ছুটলো।

শহরে পৌঁছতেই দেয়ালে দেয়ালে নজর পড়লো। স্থানে স্থানে পোষ্টার লাগানো আছে। পোস্টার ওযে বালকের ছবি সেটা তার জাভেদের। নুরী অশ্বপৃষ্ঠে বসে জাভেদের ছবি দেখলো, তার জাভেদ কি করে দেয়ালের ছবিতে এলো বুঝতে পারলো না নূরী।

অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে এলো সে দেয়ালের পাশে, খুশিতে চোখ দুটো তার দীপ্ত হয়ে উঠলো, এইতো তার জাভেদ এ কাগজে রয়েছে। নিচে কি লেখা আছে পড়তে পারে না নূরী, কারণ সে লেখাপড়া জানে না, কি করে বুঝবে দেয়ালের গায়ে কাগজে তার ছেলের ছবি কেন।

নূরী টান দিয়ে একটা পোষ্টার তুলে নিলো, তারপর ফিরে এলো সে আস্তানায়। অনুচরদের সামনে মেলে ধরলো–আমার জাভেদের ফটো বেরিয়েছে, কি লেখা আছে নিচে পড়োতো?

একজন ইংরেজি লেখাপড়া জানা অনুচর এগিয়ে এলো, সে পোষ্টারখানায় যা লেখা ছিলো পড়ে শোনালো সবাইকে

দুঃসাহসী বালক গ্রেপ্তার। এগারো জন সশস্ত্র পুলিশকে সে তীরবিদ্ধ করে নিহত করেছে।

নূরী কথাটা শুনে আনন্দিত হলো কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেলো। তার জাভেদ তাহলে বন্দী হয়েছে। নিশ্চয়ই সে তার পিতাকে উদ্ধার করতে গিয়েছিলো।

আস্তানায় সবাই যেমন প্রথমে খুশি হলো, তেমনি একটা ভীষণ দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

সর্দার বন্দী হয়েছে, তার সঙ্গে বন্দী হলো জাভেদ।

অনুচরগণ এ নিয়ে ভীষণ চিন্তিত হলো, তারা দরবার কক্ষে গিয়ে আলোচনায় মেতে উঠলো। নূরও এ ব্যাপারে অনুচরদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে লাগলো।

সবচেয়ে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো জাভেদ ছোট্ট বালক হয়ে সে কি ভয়ঙ্কর সাহস নিয়ে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেছে।

বনহুরের দরবারকক্ষে এ নিয়ে যখন গভীরভাবে আলোচনা হচ্ছে কিভাবে সর্দার ও জাভেদকে উদ্ধার করা যায় তখন হঠাৎ একটা ছোরা এসে গেথে গেলো দরবারকক্ষে মাঝের টেবিলে।

নূরী ছোরাখানা তুলে নিলো হাতে।

ছোরা বাটে একটা ছোট্ট নীল রঙের কাগজ আটকানো আছে দেখতে পেলো সে।

নূরী কাগজখানা খুলে নিয়ে একজন অনুচরের হাতে দিলো, অনুচরটা পড়ে শোনালো। কাগজে লেখা ছিলো।

তোমরা অধৈর্য হচ্ছো কেন? আমি সর্দার ও জাভেদকে মুক্ত করে আনবো।

–আশা

*

নূরী অস্ফুট শব্দ করে উঠলো–আশা! আশার এ ছোরা! সে আমাদের বিপদের কথা জানতে পেরেছে। তোমরা কিছু ভেবো না, এবার ইনশাআল্লা সর্দার ও জাভেদ মুক্ত হবে।

বনহুরের অনুচরদের সবার মুখে হাসি ফুটলো, কায়েস বললো–নূরী, তুমি ঠিক বলেছো, মনসুর ডাকুর কন্যা আশা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী, তাছাড়া তার অসাধ্য কিছু নেই।

কায়েস যা বললো কথাগুলো সত্য। আশা জীবনে বহু অসাধ্য সাধন করেছে, যদিও সে মাঝে মাঝে বিপদগ্রস্থ হয়েছে, তবু জয়ী হয়েছে সে।

কায়েস একটু থেমে বললো–কার সাধ্য আমাদের আস্তানায় প্রবেশ করে কিন্তু সে কিভাবে আমাদের দরবারকক্ষে ছোরা নিক্ষেপ করলো ভেবে দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

কায়েস এবং নূরী ছোরাখানা লক্ষ্য করে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলো, তার এবার অনেকটা আশ্বস্ত হলো!

গভীর রাতে শুরু হলো ভীষণ ঝড়বৃষ্টি আর বিদ্যুতের চমকানি। আকাশ যেন ভেঙে পড়ছে মাথার উপর। অবশ্য সন্ধ্যা হতেই আকাশে জমাট মেঘ চাপ বেধে ছিলো।

একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিলো এতক্ষণ। রাত বাড়তেই ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করলো। গাছপালা ভেঙে মুচড়ে পড়ছে যেন একাকার হয়ে। চারদিকে অন্ধকার, কোথাও কিছু নজরে পড়ছে না।

মেঘের গর্জন ছাড়া কোনো শব্দই কর্ণগোচর হচ্ছে না।

সেকি ভীষণ তাণ্ডবলীলা!

একটা অশ্বপৃষ্ঠে তীরবেগে ছুটে চলেছে এক আরোহী। তার সমস্ত শরীর ওয়াটারপ্রুফে ঢাকা। বিদ্যুতের আলোতে মাঝে মাঝে চকচক করে উঠছে তার দেহের পোশাক। বনজঙ্গল পেরিয়ে, প্রান্তর ডিংগিয়ে এগুচ্ছে অশ্বারোহী।

সম্মুখে কোথাও বাজ পড়লো!

অশ্বারোহী তবু পিছপা হলো না। অশ্বলাগাম চেপে ধরে সে বসে আছে কতকটা উবু হয়ে। অশ্ব ঝড় বৃষ্টি বস্ত্র মাথায় করে বেগে এগুচ্ছে।

অশ্বরোহী এক সময় পৌঁছে গেলো হাঙ্গেরী কারাগারের পাশে! তখনও দুর্যোগ কমেনি এতটুকু, আকাশ যেন আজ ধসে পড়বে এই মুহূর্তে।

অশ্বারোহী হাঙ্গেরী কারাগারের পাশে এসে দাঁড়ালো। বিদ্যুতের আলোতে তার দেহের পোশাক চকচক করে উঠলো। সে তাকালে হাঙ্গেরী কারাগারের প্রাচীরের উপরে দিকে। অশ্বারোহীর পিঠে বাঁধা রয়েছে একটা বড় জমকালো ব্যাগ। অশ্বারোহী পিঠের ব্যাগ থেকে একটা সিল্ক কর্ড বের করে নিলো। সিল্ক কর্ডের মাথায় ছিলো অদ্ভুত ধরনের কাটা।

অশ্বারোহী অশ্বপৃষ্ঠে বসেই সিল্ক কর্ড ছুঁড়ে মারলো হাঙ্গেরী কারাগারের সুউচ্চ দেয়াল লক্ষ্য করে। আটকে গেলো কর্ডের কাটাটা সুউচ্চ দেয়ালের সঙ্গে।

আকাশ তখন আরও ভেঙে পড়ছে যেন।

প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া বইছে।

কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই।

এ ঝড় সাধারণ ঝড় নয়, সাইক্লোন বা সামুদ্রিক ঝড় অথবা হ্যারিকেন ঝড় বলা চলে। হাঙ্গেরী কারাগারের প্রহরী কে কোথায় জীবন নিয়ে সরে পড়েছে কে জানে। অশ্বারোহী সুযোগের অপব্যবহার করলো না।

অশ্বারোহী সিল্ক কর্ড বেয়ে তর তর করে উঠে গেলো উপরে। এ কাজ তার কাছে মোটেই যেন কষ্টকর নয়, অতি সহজে সুউচ্চ প্রাচীরের উপরে উঠে বসে পুনরায় সিল্ক কর্ডখানা খুলে নিলো দ্রুতহস্তে, তারপর হাঙ্গেরীর ভিতর দিকে জুলিয়ে কাঠ বেয়ে নেমে এলো প্রাচীরের অভ্যন্তরে।

এবার অশ্বারোহী ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে গেলো যে লৌহ কারাগারে বন্দী অবস্থায় আছে দস্যু বনহুর সেইদিকে।

বনহুর তখন কারাগারকক্ষে অর্ধশায়িত অবস্থায় শুয়েশুয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিলো গতকালকের কথা। কাল যখন সে জেলকক্ষে বসে কাবাব খাচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় কয়েকজন পুলিশ একটা বালককে পাকড়াও করে এনে হাজির করেছিলো তার কারাগারের সম্মুখে।

বনহুর অবাক হয়ে গেলো, প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতেই পারছিলো না। তাড়াতাড়ি খাবার ত্যাগ করে উঠে এলো লৌহশিকের পাশে পুলিশবেষ্টিত অবস্থায় জাভেদকে দেখতে পায় সে–একি, জাভেদকে এরা কি করে পেলো! বনহুর যখন বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে আছে তখন একজন পুলিশ অফিসার একটা সংবাদপত্র লৌহশিকের মধ্য দিয়ে বনহুরের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

বনহুর সংবাদপত্রটা মেলে ধরতেই প্রথম পৃষ্ঠায় দেখতে পেলো জাভেদের ফটো, দ্রুত পড়ে গেলো। সে নিচের লেখাগুলো। সংবাদপত্রে জাভেদ সম্বন্ধে সব জানতে পেরে একেবারে স্তম্ভিত হলো সে। জাভেদ হাঙ্গেরীর কারাগারের প্রহরীদের উপর হামলা চালিয়ে এতগুলো পুলিশ প্রহরীকে খতম করেছে। বনহুরের চোখ দুটো মুহূর্তের জন্য খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো। যদিও ব্যথা পেলে জাভেদের বন্দী অবস্থা দেখে। ওর কচি হাতে শিকল পরানো, পিছনে বামে দক্ষিণে সমস্ত পুলিশ প্রহরী। জাভেদ পিতাকে দেখতে পেয়ে খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠলো। যদি লৌহশিকলে তার হাত দু’খানা আবদ্ধ না থাকতো তবে ছুটে যেতে সে পিতার লৌহশিকলের পাশে। জাভেদ কিছু বলতে চাচ্ছিলো কিন্তু প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে সে চুপ হয় গেলো। বনহুর ব্যথিত হলেও আনন্দিত, গর্বিত–তার জাভেদ তার মতই হয়েছে, অন্যায়কে সে সহ্য করতে পারেনি। না জানি জাভেদ বন্দীশালায় একা কি করছে.....হয়তো বা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিংবা ভীষণ ঝড়ো হাওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে....

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, সে চমকে উঠলো, কে যেন তার কারাগারের লৌহশিকের পাশে এসে দাঁড়ালো।

ভীষণ ঝড়ের দাপটে হাঙ্গেরীর কারাগার যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। মেঘের গর্জনের সঙ্গে মুহূর্তে মুহূর্তে বজ্রপাত হচ্ছে। একটা প্রাণীও নেই, সবাই আত্নরক্ষা করেছে ঝড়ের দাপট থেকে। বনহুর জেগেছিলো এবং সে লক্ষ্য করলো তার কারাকক্ষের লৌহশিকের পাশে কেউ দাঁড়িয়ে কিছু করছে। বনহুর উঠে দাঁড়ালো, তারপর লঘু পদক্ষেপে এগুলো।

প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে পানির ঝটকা এসে লাগছে বনহুরের শরীরে। এবার বনহুরকে এমন এক কারাকক্ষে আটক করে রাখা হয়েছিলো যার দরজা ছিলো শুধু লৌহশিকের তৈরি। সর্বক্ষণ প্রহরীরা যেন তার উপর নজর রাখতে সক্ষম হয়। লৌহশিকগুলো ছিলো এত মজবুত এবং মোটা যার সাধ্য নেই। কেউ তা থেকে বাঁচতে পারে।

বনহুরের চোখেমুখে ঝড়ো হাওয়ার ঝাপটা লাগছিলো, সে হাতের আড়ালে চোখ বাঁচিয়ে ভালভাবে তাকালো। বিদ্যুতের আলোতে দেখতে পেলো কেউ শিক কেটে ফেলার চেষ্টা করছে।

বনহুর ঝড়ঝাটা অগ্রাহ্য করে আরও এগিয়ে এলো। সে দেখতে পেলো প্রায় তিনখানা শিক কেটে ফেলা হয়েছে। আরও লক্ষ্য করলো বনহুর ছায়ামূর্তির হাতে একটা অদ্ভুত যন্ত্র রয়েছে, ছায়ামূর্তি সেই যন্ত্র যারা শিক কেটে ফেলছে।

বুঝতে পারলো বনহুর, নিশ্চয়ই তার কোনো অনুচর। বনহুর আরও সরে এলো, নিকটে আসতেই চাপাক শুনতে পেলো–বনহুর, শিগগির বেরিয়ে এসো!

বুঝতে পারলো বনহুর, নিশ্চয়ই তার কোনো অনুচর। বনহুর আরও সরে এলো, নিকটে আসতেই চাপাকণ্ঠ শুনতে পেলোবনহুর, শিগগির বেরিয়ে এসো!

বনহুর বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–তুমি!

হাঁ, এক মুহূর্ত বিলম্ব করো না।

বনহুর কাটা শিকলোর ফাঁকা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

ছায়ামূর্তি বললো–তাড়াতাড়ি জাভেদকে বের করে নাও। সে কোথায় আছে তুমি কি জানো বনহুর

বনহুর ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে অন্ধকারে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো ছায়ামূর্তির দিকে। বললো–তুমি কি করে এই ভীষণ ঝড়ের মধ্যে হাঙ্গেরী কারাগারে প্রবেশ করলে আশা!

সে কথা পরে শুনো, এবার জাভেদকে মুক্ত করতে হবে। তুমি কি জানো জাভেদ কোথায় আছে?

হা জানি! তাকে আমার পাশের কারাকক্ষেই আটক করে রাখা হয়েছে। বনহুর কথাটা বলে আশার হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে সরে গেলো অন্ধকারে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো, তার কাঁধে জাভেদ। ঝড়বৃষ্টির দাপটে সে দিশেহারা হয়ে পড়েছে, কারণ আচমকা তাকে তুলে নিয়েছে বনহুর কাঁধে, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসেছে ঝড়ো হাওয়ার মধ্যে।

আশা বললো–এসেছো?

বনহুর জাভেদকে কাঁধে নিয়ে দ্রুত প্রাচীরের দিকে এগুলো।

আশা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

সিল্ক কর্ড ঝুলছিলো।

বিদ্যুতের চমকানিতে বনহুর স্পষ্ট দেখতে পেলো রশিখানা। মুহূর্ত বিলম্ব না করে বনহুর জাভেদ সহ সিল্ক কর্ড বেয়ে উঠে গেলো উপরে।

আশাও ততক্ষণে সিল্ক কার্ড বেয়ে উপরে উঠে চলেছে।

প্রাচীরের নিচেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ছিলো অশ্বটা। বনহুর জাভেদ সহ অশ্বপৃষ্ঠে লাফিয়ে পড়লো। আশা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়, এত উঁচু থেকে কি করে বনহুর জাভেদ সহ ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে পড়লো! এ যেন অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য।

কিন্তু এখন এসব চিন্তার সময় নেই আশাও প্রাচীরের গা বেয়ে সিল্ক কর্ডের সাহায্যে নেমে এলো প্রাচীরের মাঝামাঝি। বনহুর আশাকে ঘোড়ার পিঠে দ্রুত নেমে পড়ার নির্দেশ দিলো।

আশা লাফিয়ে পড়েলো অশ্বের পিছনে অংশে। বনহুর, আশা আর জাভেদকে নিয়ে অশ্বটা তীরবেগে ছুটলো।

সিল্ক কর্ড ঝুলে রইলো হাঙ্গেরী কারাগারের প্রাচীরের সঙ্গে।

*

পরদিন হাঙ্গেরী কারাগারের সিল্ক কর্ড ব্যাপার নিয়ে এবং বনহুর ও জাভেদের অন্তর্ধান নিয়ে কান্দাই সংবাদপত্রে বেরুলো নানা ধরনের সংবাদ। জাভেদের ছবি বের হলো সবগুলো সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায়।

কান্দাইবাসীরা বিস্ময়ে হতবাক হলো, কেমন করে এতটুকু ছেলে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে দস্যু বনহুর সহ পালাতে সক্ষম হয়েছে।

কান্দাই পুলিশ পরদিন নানাভাবে সন্ধান চালিয়েও প্রাচীরের পাশে কোনো মানুষের পদচিহ্ন আবিস্কার করতে পারলো না, শুধু তাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়লো অশ্বপদচিহ্নের কয়েকটা ছাপ।

মিঃ জাফরী স্বয়ং এলেন অনুসন্ধানে, তিনি সমস্ত হাঙ্গেরী কারাগার পরীক্ষা করে দেখলেন। শুধু মিঃ জাফরী নন আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার মিঃ জাফরীর সঙ্গে হাঙ্গেরী কারাগারের যে কক্ষ দুটিতে বনহুর আর জাভেদকে বন্দী রাখা হয়েছিলো সেই কক্ষগুলো, পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। তারা বিস্মিত হলেন, হাঙ্গেরী কারা কক্ষের সুদৃঢ় লৌহশিক কোনো সূক্ষ্ম যন্ত্র দ্বারা কেটে ফেলা হয়েছে এবং তা বাঁকিয়ে বেরিয়ে এসেছে দস্যু বনহুর তার ভিতর থেকে বালকও যে দস্যু বনহুরের সঙ্গে গেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সবচেয়ে বড় এবং বিস্ময়কর কথা হলো বাইরে থেকে কেউ সিল্ক কর্ড বেয়ে হাঙ্গেরী কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করেছিলো এবং ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই এসেছিলো নিরাপদ স্থানে। ঐ সুযোগ গ্রহণ করেছিলো কোনো অশ্বারোহী। কিন্তু কে সেই অশ্বারোহী? পুলিশমহল অনেক সন্ধান চালিয়েও কোনো সুফল লাভ করতে সক্ষম হলো না।

মিঃ জাফরীর এ আর একদফা চরম পরাজয় বনহুরের কাছে। শুধু মিঃ জাফরীই নন, কান্দই পুলিশ মহলের পরাজয়, হাঙ্গেরী কারাগারের পরাজয়।

পুলিশ মহলের এ পরাজয় সাধনে সহায়ক হয়েছিলো হ্যারিকেন ঝড় বা সাইক্লোন। পুলিশমহলের মুখ কালো হয়ে গেছে, তারা কল্পনাও করতে পারেনি এমন হবে। তারা এবার দস্যু বনহুরকে আটক রেখেছিলেন নতুন ধরণের কারাকক্ষে, যে কারাকক্ষের অভ্যন্তরে প্রহরীরা সব দেখতে পাবে। শুধু মোটা মোটা শিক দ্বারা দরজার বেষ্টনী আটকানো থাকতো যেন কোনোক্রমে বনহুর দৃষ্টির আড়াল হতে না পারে।

এত সাবধানতাও ব্যর্থ হলো পুলিশ মহলের। সমস্ত শহরে দেখা দিলো একটা ভীষণ চাঞ্চল্য। সবার মুখে ঐ একই কথা–দস্যু বনহুর এবারও হাঙ্গেরী কারাগার থেকে পালাতে সক্ষম হয়েছে। এবার তার অন্তর্ধান বা নিরুদ্দেশ আরও বিস্ময়কর। নানা জনের মুখে নানাভাবে কথাটা ছড়িয়ে মুখে এই কাহিনী নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা সৃষ্টি হলো।

মনিরার কানেও গেলো সব কথা।

সংবাদপত্র পড়লো বিস্তারিত খবর। মনিরার মনে শুধু স্বামীর চিন্তাই হচ্ছে না, হচ্ছে বহু প্রশ্নের উদ্ভব। তার স্বামীকে পুলিশ মহল গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর সে ভীষণ চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু যখন সংবাদপত্রে একটা বালক সম্বন্ধে অদ্ভুত সংবাদ নজরে পড়লো তখন শুধু বিশ্বয়ই জাগলো না, তার মনে উদয় হলো নানা প্রশ্ন। কে এই বালক, যার চেহারার সঙ্গে নূরের হুবহু মিল আছে। আর মিল আছে বনহুরের সঙ্গে। এতটুকু বালক হয়ে কেনই বা সে বনহুরের উদ্ধার ব্যাপারে এগিয়ে এলো। নিশ্চয়ই এর পিছনে আছে কোনো গোপন রহস্য...... মনিরা যত ভাবছে ততই কেমন যেন হতবাক হয়ে পড়ছে। তারপর যখন জানতে পারলো গত রাতে ভীষণ ঝড়ো হাওয়া মধ্যে কোনো অশ্বারোহী হাঙ্গেরীর সুউচ্চ প্রাচীর ডিংগিয়ে কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করে কারাকক্ষের সুদৃঢ় শিক কেটে বনহুর আর সেই বিস্ময়কর বালককে উদ্ধার করে নিয়ে গেছে, তখন মনিরার বিস্ময় আরও বেড়েছে। নিশ্চয়ই তার স্বামীর সঙ্গে ঐ বালকের কোনো সম্বন্ধ আছে। কিন্তু কি সম্বন্ধ হতে পারে.......

মনিরা যখন বনহুর সম্বন্ধে নানা রকম চিন্তা করে চলেছে তখন বনহুর আর জাভেদ সহ আশা এসে পৌঁছেছে এক নিভৃত পর্বতগুহায়। এখানে আশার

আস্তানা না হলেও আশা বাঘা সহ আপাতত এখানেই রয়েছে।

ছোট্ট গুহা।

কিন্তু বেশ পরিচ্ছন্ন।

সম্মুখে একটা পাহাড়িয়া ঝর্ণা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে চলেছে নিচের দিকে। ঝর্ণার ধারে কতকগুলো ঝামগাছ। গাছের আশেপাশে লতাগুলাগুলো ঝুলে রয়েছে ঝর্ণার বুকের উপর। ঝিরঝিরে বাতাসে দোল খাচ্ছে লতা গুলগুলো।

গুহার পাশে এসে দাঁড়ায় বনহুর আর আশা।

জাভেদ তখন গুহামধ্যে নিদ্রায় অচেতন। সেদিন ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভিজে একটু শরীর খারাপ হয়েছে জাভেদের। তাছাড়া রাতে ঘুম হয়নি, তাই সে সকালে ঘুমিয়ে আছে।

বনহুর আর আশা যখন ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়ালো, তখন বাঘাও এসেছে হাতের পাশে।

বনহুর বাঘার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো–একে তুমি সঙ্গী করে নিয়েছে আশা?

হাঁ, ও আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গীই বটে।

আশা।

বল বনহুর।

হাঙ্গেরী কারাগারের আকাশচুম্বী প্রাচীর ডিংগিয়ে তুমি আমাকে ও জাভেদকে উদ্ধার করেছে। আশা, সত্যি আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। শুধু একবার দুবার নয়, তুমি বহুবার আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করেছো।

তোমাকে ভালবাসি তাই এটুকু সুযোগ আমার ভাগ্যে এসেছে।

কিন্তু আমি তোমার ভালবাসার প্রতিদানে তোমাকে কিই বা দিয়েছি...... বনহুর একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে যায় আলগোছে।

আশা ঝর্ণার সচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে আনমনাভাবে বলে–এ কথা কেন মনে করো বনহুর? আমি জানি, সব জানি, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না আমার জন্য।

আশা!

তুমি আমার সাধনার! তোমাকে ভালবেসে আমি শান্তি পাই, স্বস্তি পাই, এ অধিকার থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না বনহুর।

কিন্তু........।

কোনো কিন্তু নেই, তুমি সচ্ছন্দে যেতে পারো। আমি দেখে আসি জাভেদ ঘুম থেকে জেগেছে কিনা। কথাটা বলে চলে যায় আশা।

বনহুর আপন মনে ভাবতে থাকে।

এমন সময় ফিরে আসে আশা বলে সে–জাভেদের ঘুমত এখনও ভাঙেনি।

বনহুর শান্তকণ্ঠে বলে উঠে–বসো! আমার পাশে বসো আশা।

বনহুর বসে পড়েছিলো পূর্বেই, এবার আশা বসলো তার পাশে।

বাঘা বসে আছে একটু দূরে।

মাঝে মাঝে সে বনহুর আর আশার দিকে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, বিরাট দেহটা ওর দুলছিলো নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে। চোখ দুটো লাল টকটক করছে। কোনো হিংস্র জন্তু দেখতে পেলে এই মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলবে সে তার দেহটা।

নীল সচ্ছ পানির বুকে ছায়া পড়ে বাঘার।

বাঘা মাঝে মাঝে নিজের প্রতিবিম্বের দিক লক্ষ্য করে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো।

বনহুর বললো–আশা, আমি চলে যাবার পর তুমিও ফিরে যাও তোমার আস্তানায়, কারণ এ স্থান তোমার জন্য নিরাপদ নয়। পুলিশ এখানে সন্ধান চালাতে পারে।

কথা শেষ হয় না বনহুরের, একটা গুলী সা করে চলে যায় বনহুরের পাশ কেটে।

বনহুর আমাকে টেনে নেয় পাশে, বললো–শিগগির শুয়ে পড়ো! বনহুর নিজেও শুয়ে পড়লো ঝর্ণার ধারে।

আশা শুয়ে পড়লো তার পাশে।

বাঘা উঠে দাঁড়িয়েছে এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকাচ্ছে সম্মুখে, যেদিক থেকে গুলীটা এসেছিলো সেইদিকে। তারপর বাঘা ছুটলো ভীষণ বেগে। সোজা পথ ধরে বাঘা এগুলো না, সে ঝোঁপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগুতে লাগলো।

বনহুর বললো–আশা, নিশ্চয়ই পুলিশ বাহিনীর লোক আমাদের দেখে ফেলেছে।

আশা বলে উঠলো–আমারও তাই মনে হচ্ছে। জাভেদ গুহায় ঘুমিয়ে আছে, হঠাৎ যদি সে জেগে উঠে বেরিয়ে আসে।

আশা আর বনহুরের মাথার উপর দিয়ে সা করে আরও একটা গুলী চলে গেলো।

বনহুর বললো–আশা, পুলিশ আমাদের দেখে ফেলেছে। তারা আমাদের জীবন্ত ধার ত্যাগ করে মৃত অবস্থায় গ্রেপ্তার করার সুযোগ নেবে, তাই তারা অবিরাম গুলী ছুড়ছে।

ঠিক তাই হবে, নাহলে এখানে জনমানব আসবে কোথা থেকে।

এদিকে বাঘা এগুচ্ছে যেদিক থেকে গুলী আসছিলো সেই দিকে। কিন্তু বেশিদূর তাকে এগুতে হলো না, সে স্পষ্ট দেখলো একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন পুলিশ বাহিনীর লোক, তাদের হাতে রাইফেল। আরও কয়েকজন এগুচ্ছে সেদিকে যেদিকের গুহায় ঘুমিয়ে আছে জাভেদ।

বাঘা থমকে দাঁড়ালো, তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগলো ওরা কোন দিকে যায়। যখন সে বুঝতে পারলো পুলিশ বাহিনী গুহার দিকে এগুচ্ছে তখন মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাঘা ছুটলো গুহা অভিমুখে।

ঝোঁপঝাড় অতিক্রম করে বাঘা দৌড়াচ্ছে।

একজন পুলিশের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো বাঘার উপর। সঙ্গে সঙ্গে সে রাইফেল উঁচু করে গুলী ছুড়লো বাঘাকে লক্ষ্য করে।

বাঘা উবু হয়ে শুয়ে পড়লো।

গুলীটা বাঘার মাথার উপর দিয়ে সা করে চলে গেলো।

বাঘা উঠে দাঁড়িয়ে তীরবেগে ছুটলো।

মাত্র কয়েক মিনিট।

বাঘা একেবারে পৌঁছে গেলো গুহার কাছাকাছি। ততক্ষণে পর পর আরও কয়েকটা গুলী চলে গেলো বাঘার দেহের উপর দিয়ে।

যখনই গুলী ছোড়ে তখনই বাঘা মাটিতে মুখ লাগিয়ে শুয়ে পড়ে। এমনভাবে কয়েক মিনিট ছুটে সে এসে পড়ে পুলিশ তিনটার কাছাকাছি।

যে পুলিশটা বাঘাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছিলো বাঘা আচম্বিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

পুলিশটা অস্ত্রসহ মুখ থুবড়ে পড়লো মাটিতে। বাঘা পুলিশটার কণ্ঠদেশ কামড়ে ঝাঁকুনি দিলে খুব করে। সঙ্গে সঙ্গে বাঘার দাঁতগুলো পুলিশটার কণ্ঠদেশ ভেদ করে বেরিয়ে পড়লো।

ঐ দণ্ডে অন্য পুলিশ দুজন গুলী ছুড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলো কিন্তু গুলী ছুঁড়তে পারছে না ওরা, কারণ কুকরটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লে ভূপাতিত পুলিশটার বুকে বা শরীরে বিদ্ধ হতে পারে।

ততক্ষণে বাঘা প্রথম পুলিশকে খতম করে দ্বিতীয় পুলিশটার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাকেও ধরাশায়ী করে কণ্ঠ বিছিন্ন করলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এলো পুলিশটার গলা দিয়ে, তারপর নীরব হয়ে গেলো তার দেহটা।

তৃতীয় পুলিশটা দিলো ভো দৌড়।

বাঘা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে তাকালো যে পুলিশটা ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলো তার দিকে। ওকে পালাতে দেখে বাঘা গম্ভীর মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। ভীতুজনকে বাঘা আক্রমণ করে না।

পুলিশটা চলে যেতেই বাঘা গুহামধ্যে প্রবেশ করলো এবং জাভেদের জামা ধরে টানতে লাগলো।

যদিও বাঘা জাভেদের সঙ্গে তেমনভাবে পরিচিত ছিলো না, তবু সে বুঝতে পারে তার মনিবের আপনজন বলতে এই বালক। তাই বাঘা মরিয়া হয়ে পুলিশদের খতম করে তাকে উদ্ধার করলো।

জাভেদ জেগে উঠতেই বাঘা তার কাপড় ধরে টানলো।

জাভেদ বুঝতে পারলো বাঘা কিছু বলতে চায়। হঠাৎ তার নজর পড়লো বাঘার মুখে! একি, বাঘার মুখে রক্ত কেন! জাভেদ ছুটে বেরিয়ে এলো বাইরে, একসঙ্গে পাশাপাশি দুটি রক্তাক্ত মৃতদেহ দেখে অবাক হলো সে এবং বুঝতে পারলো এ কাজ বাঘার।

জাভেদের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাঘা।

হঠাৎ পিছনে দৃষ্টি পড়তেই দেখলো কয়েকজন পুলিশ তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে।

জাভেদ বাঘাকে লক্ষ্য করে বললো–বাঘা, আমার সঙ্গে আয়। জাভেদ ছুটলো বোপঝাড় ডিংগিয়ে।

বাঘা তাকে অনুসরণ করলো।

ওদিকে বনহুর আর আশা বুকে ভর করে ঝোঁপঝাড় আর টিলার ফাঁক দিয়ে পুলিশ বাহিনীর নিকটে এসে পৌঁছে গেলো। পুলিশ বাহিনীর দুজন একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের পূর্বের জায়গা লক্ষ্য করে গুলী ছুড়লো। তারা অবাক হয়ে দেখছে ওরা গেলো কোথায়।

বনহুর আর আশা ততক্ষণে এসে পড়েছে ঠিক তাদের পিছন অংশে টিলার নিচে। বনহুর এবার পেছন থেকে একজনকে জাপটে ধরে ফেলে এবং প্রচণ্ড ঘুষি লাগিয়ে তাকে ধরাশায়ী করে। সঙ্গে সঙ্গে অপরজন আক্রমণ করে বনহুকে।

বনহুর তাকেও ধরাশায়ী করে।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে অপরজন উঠেই রাইফেল তুলে নিয়ে তাক করে বনহুরকে লক্ষ্য করে।

আশা ঠিক ঐ সময় তার হাতে একটা গাছের ভাঙা ডাল দিয়ে আঘাত করে।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশটার হাত থেকে খসে পড়ে রাইফেলখানা, গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

বনহুর তখন ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে চলেছে পুলিশটার চোয়ালে।

এরপর একজন যার হাতে আশা গাছের ডাল দিয়ে আঘাত করেছিলো সে আর দাঁড়াতে পারে না, হয়তো ওর হাতের এখনা হাড় ভেঙে গিয়েছিলো। পুলিশটা দিলো চোচা দৌড়।

পিছন ফিরে তাকালো না সে।

বেশ কিছু দূরে ছিলো তাদের ভ্যান।

বাঘার তাড়া খেয়ে ঐ পুলিশটাও ভ্যানে এসে হাঁপাচ্ছে। হাতে চেপে ধরে সেও এলো, তাড়াতাড়ি ভ্যানে উঠে বসে আর্তনাদ শুরু করে দিলো।

ততক্ষণে অন্যান্য পুলিশ যারা বনের মধ্যে এবং পাহাড়ের পাদমূলে ছড়িয়ে পড়েছিলো তারা সবাই একত্রিত হয়ে ভ্যানে চেপে বসলো। এসেছিলো তারা প্রায় দশ জন, এখন দেখা গেলো গাড়িতে ফিরে এসেছে সতের জন, বাকি তিন জন বাঘা এবং বনহুরের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।

পুলিশগণ সবাই অস্ত্র হারিয়েছে, এমন অবস্থায় বনহুরকে গ্রেপ্তারের আশা তাদের মন থেকে করের মত উবে গেলো। তারা এখন জীবন নিয়ে পালাতে পারলে বেঁচে যায়।

ভ্যান নিয়ে ছুটলো পুলিশ বাহিনী কান্দাই শহর অভিমুখে।

*

পুলিশ বাহিনীর অবস্থা দেখে মিঃ জাফরী ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন– আমি জানতাম আপনারা কিছু করতে পারবেন না, শুধু পরাজয়ের কালিমা মুখে লেপে ফিরে আসবেন।

পুলিশ বাহিনী যারা কান্দাই জঙ্গলে সন্ধান চালাতে গিয়েছিলো তার অধিনায়ককেই লক্ষ্য করে মিঃ জাফরী কথাগুলো বললেন।

পুলিশ অধিনায়ক মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মুখমণ্ডল ম্লান ও কালো হয়ে আছে। তার পিছনে দণ্ডায়মান অন্যান্য পুলিশ যারা গতকাল পুলিশ ভ্যান নিয়ে বুক ফুলিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলো দস্যু বনহুর ও জাভেদকে পাকড়াও করবে বলে, তারা আহত অবস্থায় কোকাচ্ছে।

মিঃ জাফরী রাগত কণ্ঠে বললেন–বনহুরকে আপনি চোখে দেখলেন অথচ তাকে জীবিত বা মৃত গ্রেপ্তার করতে পারলেন না?

এবার মাথা তুললেন পুলিশ অধিনায়ক, বললেন তিনি–স্যার, আমরা বনহুরকে মৃত অবস্থায় আনবো, এই ইচ্ছা নিয়েই তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলাম কিন্তু……

কিন্তু পারলেন না?

স্যার!

আমি জানতাম পারবেন না।

স্যার, এমনভাবে তাকে হাতের মুঠায় পেয়েছিলাম।

তবু তো পরাজয় বরণ করে ফিরে এসেছেন?

স্যার, আমার মনে হয়……

বলুন থামলেন কেন?

আমার মনে হয় সে ঐ জঙ্গলেই আছে।

এ অমানুষিক কাজ করে আপনার মনে দানা বাঁধলো?

কারণ তার সঙ্গে আরও একজন ছিলো।

সে পুরুষ না নারী?

তার দেহের পোশাক বনহুরের মতই ছিলো, কাজেই সে নারী না পুরুষ বোঝা যাচ্ছিলো না।

অপর একজন পুলিশ বললো–স্যার, আমি একটা গুহার মধ্যে সেই বালকটাকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেছি, কিন্তু…..

কি বললেন সেই বালকটাকে দেখেছিলেন?

হা স্যার, কিন্তু মুহূর্তের জন্য দেখেছি, ঐ দন্ডে বিরাটদেহী এক কুকুর আমাদের আক্রমণ করে।

বলো কি–কুকুর?

হা স্যার, সে আমাদের দু'জন পুলিশকে নখ ও দাঁত দিয়ে হত্যা করেছে।

একটা সামান্য কুকুর তোমাদের দু'জনকে হত্যা করলো আর তোমরা কিছু করতে পারলে না।

স্যার, কুকুর তো নয় যেন রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এমন কুকুর আমরা কোনোদিন দেখিনি।

মিঃ জাফরী বললেন–ই। একটু থেমে বললেন–তোমাদের যারা নিহত হলো কুকুরের আক্রমণে, তাদের লাশ কি করেছে?

স্যার, লাশগুলো আনা সম্ভব হয়নি, কারণ আমরা তখন এমন এক অবস্থায় ছিলাম তাতে কিছু ফিরে তাকাবার মত..

সাহস হয়নি, এই তো? মিঃ জাফরী পুলিশটার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন।

স্যার, মিথ্যা নয়, সে এক ভয়ঙ্কর জীব!

মিঃ জাফরী পুলিশ অধিনায়কটাকে লক্ষ্য করে বললেন–আপনি একশ' সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিন। আমি নিজে যাবো আপনাদের সঙ্গে, দেখবো কোথায় সে কুকুর আর বনহুর ও তার সঙ্গী।

আচ্ছা স্যার।

আজই তৈরি হয়ে নিন, কারণ বিলম্ব হলে তাদের নাও পেতে পারি। যান, আপনি এক্ষুণি পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত হতে বলুন।

পুলিশ অধিনায়ক বেরিয়ে যান।

মিঃ জাফরী তার সহকারীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ–আলোচনায় মেতে উঠেন। কোন কোন অফিসার তার সঙ্গে জঙ্গলে যাচ্ছেন, এ নিয়েও তিনি আলাপ করেন।

কিন্তু অন্যান্য অফিসার যখন শুনলেন তাদেরকেও যেতে হবে মিঃ জাফরীর সঙ্গে, তখন মুখ কালো হলো সবার, তারা কেটে পড়ার নানারকম ওজর আপত্তি জানালেন কিন্তু মিঃ জাফরী ছিলেন ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ এবং জেদীও, তার যা কথা, তাই তার কাজ। কেউ আর তার আদেশ অমান্য করার সাহস পেলেন না।

তিনটা ভ্যান পূর্ণ করে নিলেন পুলিশ বাহিনী।

সম্মুখ ভ্যানে কয়েকজন পুলিশ অফিসারসহগ মিঃ জাফরী রইলো। সবার হাতেই রিভলভার, রাইফেল।

ভ্যানগুলো একসঙ্গে এগুলো সারিবদ্ধভাবে।

জঙ্গলের মধ্যে যখন তাদের ভ্যানগুলো প্রবেশ করলো তখন বেলা প্রায় গাড়িয়ে এসেছে।

ভ্যান তিনটা জঙ্গলের একটা ঝোঁপের আড়ালে রেখে মিঃ জাফরী দলবলসহ নেমে পড়লেন। সবাই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হলেন।

মিঃ জাফরী এবং কয়েকজন দক্ষ পুলিশ অফিসার আগে আগে ও পিছনে পুলিশ বাহিনী এগিয়ে চলেছে। তাদের সবাইকে পথ চিনিয়ে নিয়ে চলেছেন পূর্বদিনের সেই পুলিশ অধিনায়ক, যিনি প্রথম দিন বনহুর ও বাঘার কাছে পরাজয় বরণ করে গেছেন।

তার মনে ছিলো ভীষণ আক্রোশ, যেমন করে থোক কুকুরটাকে এবং বনহুরকে পাকড়াও করবেন কিংবা করবেন হত্যা। পুলিশ অধিনায়ক নিজে একটা গুলীভরা রাইফেল বাগিয়ে এগুচ্ছিলেন, আজ যেন তার পরাজয় বরণ করতে না হয়।

পুলিশ বাহিনী সহ মিঃ জাফরী এক সময় সেই স্থানে এসে পৌঁছলেন যেখানে বাঘার কবলে পড়ে নিহত হয়েছিলো দু'জন পুলিশ।

পুলিশ দু'জনের মৃতদেহ তখনও তেমনি পড়ে আছে সেই গুহার সম্মুখে একটি অসমতল পাথরখন্ডের উপর। তাদের দেহের স্থানে স্থানে শিলায় বা কোনো জন্তুর ভক্ষণের চিহ্ন বিদ্যমান রয়েছে।

বাঘার দাঁতের আঘাতের ক্ষত দিয়ে তখন যে রক্ত বেরিয়ে এসেছিলো তা এখন জমাট বেঁধে আছে। মৃতদেহ দুটি বিকৃত দেখাচ্ছে। মিঃ জাফরী ও তার দলবল বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন তার পুলিশ দু'জনের অবস্থা।

মিঃ জাফরী বললেন–নিশ্চয়ই এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়, সে দস্যু বনহুরের অনুচর তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার এক একজন একএক রকম আলোচনা করতে লাগলেন। বেশিক্ষণ এখানে দাঁড়ানো তাদের উচিত হবে না, তাড়াহুড়ো করে সন্ধান চালাতে হবে, নাহলে সন্ধ্যা হবেই এই জঙ্গলে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে নানারকম হিংস্র জীবজন্তু আসবে তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুরকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে কিনা এটা কেউ সঠিকভাবে ভাবতে পারলেন না, কারণ তাকে খুঁজে বের করা এক অসম্ভব ব্যাপার! তবু তারা এ জঙ্গলে এসেছেন বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়েই। সেটাই হলো আসল এবং মূল উদ্দেশ্য মিঃ জাফরী ও তার সঙ্গীদের।

নিহত পুলিশ দু’জনের লাশ ভ্যানে তুলে নেবার নির্দেশ দিয়ে মিঃ জাফরী অগ্রসর হলেন। অদূরেই সেই গুহা যে গুহার মধ্যে আশা এবং বাঘা বাস করতো।

গুহামধ্যে মিঃ জাফরী সঙ্গীদের নিয়ে প্রবেশ করলেন। গুহার মুখপ্রশস্ত থাকায় গুহামধ্যে প্রচুর আলো ছিলো, তাই তার স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

গুহার মধ্যে কিছু আসবাব ছিলো–দুটি বর্শা, একটা চামড়ার আলখেল্লা, একটা রিভলভার এবং একটা চিরুণী।

মিঃ জাফরী চিরুণীটা হাতে তুলে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন, তারপর তিনি চিরুণী থেকে একটা লম্বা চুল খুলে নিয়ে নিজের চোখের সম্মুখে ধরে বললেন–এই গুহায় যে বাস করতো সে নারী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অন্যান্য অফিসারও দেখতে লাগলেন। সবাই দেখলেন চিরুণীর সঙ্গে একটা সুদীর্ঘ চুল আটকানো আছে।

মিঃ জাফরী বললেন–এই নারীটাকে আপনারা গতকাল বনহুরের সঙ্গে ঝর্ণাধারে দেখেছিলেন।

বললেন পুলিশ অধিনায়ক–হাঁ স্যার, তাই হবে। যদিও আমরা বহুদিন থেকে তাদের দেখতে পেয়েছিলাম তবু বুঝতে পারছিলাম বনহুরের সঙ্গে ব্যক্তির চেহারা সন্দেহপূর্ণ ছিলো।

কিন্তু এই নারীই দস্যু বনহুর এবং সেই দুর্ধর্ষ বালককে হাঙ্গেরীর সুদৃঢ় অভ্যন্তর থেকে উদ্ধার করে আনতে সমর্থ হয়েছিলো তাতে কোনো ভুল নেই।

হাঁ স্যার, বিস্ময়ভরা নারী বটে। বললেন একজন পুলিশ অফিসার।

গতদিনের পরাজিত পুলিশ অধিনায়ক বললেন–শুধু ঐ নারীই নয়, দস্যু বনহুরের অনুচর কুকুরটাও তেমনি বিস্ময়কর স্যার।

ঠিক বলেছেন, যেমন দুর্দান্ত দস্যু বনহুর তেমনি তার সঙ্গিনী নারী এবং তার কুকুর।

যখন বনহুর আর তার সঙ্গিনীর সন্ধান করছিলেন পুলিশ বাহিনী, তখন পাহাড়ের গোপন এক গুহার মুখে দাঁড়িয়ে বনহুর চোখে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগিয়ে দেখছিলো। পুলিশ বাহিনীর হয়রানি লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাসছিলো সে।

আশা পাশে দাঁড়িয়ে, তার মুখভাব প্রসন্ন দীপ্ত। তার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে জাভেদ। আশা জাভেদের মাথায় হাত রেখে মাঝেমাঝে আদর করছিলো।

বাঘা দাঁড়িয়ে আছে সবার সম্মুখে।

সেও বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি ফেলছিলো দূরে অনেক দূরে।

বনহুর দূরবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো–আশা, দেখো ওরা গুহা থেকে বেরিয়ে সোজা ওদিকে চলে যাচ্ছে।

আশা বনহুরের হাত থেকে দূরবীক্ষণযন্ত্রটা নিয়ে চোখে লাগিয়ে দেখে নিলো, তারপর বললো–বনহুর, যদি বলো আমি বাঘাকে পাঠিয়ে ওদের একবার দেখিয়ে দেই।

থাক, কাল যা নাকানি চুবানি খেয়েছে তাতেই ওরা হিমসিম খেয়েছে……

তবুতো এসেছে আবার?

পুলিশ বাহিনী হুকুমের দাস, ওরা এসেছে হুকুম পালন করতে, তবে আসল লোকটাও আজ সঙ্গে আছে দেখছি…….

আসল লোকটা কে?

কান্দাই পুলিশ বাহিনীর প্রধান মিঃ জাফরী।

মিঃ জাফরী।

হাঁ।

যে তোমাকে গ্রেপ্তার করে হাঙ্গেরী কারাগারে ভরেছিলো?

হাঁ, একবার নয়, বেশ কয়েকবার মিঃ জাফরী আমাকে গ্রেপ্তার করে হাঙ্গেরীর অভ্যন্তরে নিয়ে গিয়েছিলো।

তাহলে ও মোটা অংক পুরস্কার লাভ করেছে বেশ কয়েকবার?

সেদিক দিয়ে মিঃ জাফরীকে মহৎ ব্যক্তি বলা যায়, কারণ তিনি ঐ পুরস্কার গ্রহণ করেননি।

এত টাকার মোহ মিঃ জাফরী ত্যাগ করতে পারলে?

সেদিক দিয়ে মিঃ জাফরী ধন্যবাদের পাত্র। ঐ দেখো ওরা বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে।

আমরা তাহলে.......

হাঁ, নিশ্চিন্ত বলতে পারো।

আশা দূরবীক্ষণযন্ত্র চোখে লাগিয়ে দেখছিলো, সে এবার বললো–লাশগুলো ওরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

তা তো যাবেই, নাহলে মৃতদেহগুলো ওদের অভিশাপ করবে যে!

বনহুর আর আশা যখন কথাবার্তা বলছিলো তখন জাভেদ অভিমানে ফুলছিলো তাকে এতক্ষণও দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দেখতে দেওয়া হয়নি বলে।

এবার সে বলেই বসলো–আব্বু, আমাকে একটু দেখতে দাও।

আশা তাড়াতাড়ি দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা জাভেদের হাতে দিয়ে বললো–তাই তো, আমরা এতক্ষণ ভুলেই গিয়েছিলাম। এবার তুমি দেখো জাভেদ, পুলিশ বাহিনীর লোকরা কেমন করে তোমার আব্বর সন্ধান

জাভেদ গম্ভীর মুখে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ লাগিয়ে দেখলো, তারপর বললো–ওরা এদিকে এলো না কেন? আমি ওদের সবাইকে মজাটা দেখিয়ে ছাড়তাম।

থাক, আজ আর মজা দেখিয়ে কাজ নেই, তোমার আম্মি কেঁদে কেটে সারা হয়ে গেলো। কথাগুলো বলে আশা জাভেদের চিবুক ধরে নাড়া দিয়ে একটু আদর

করলো।

জাভেদ বললো–আম্মি বড্ড ভীতু।

আসলে ভীতু নয় সে, সব মা–ই সন্তানের অমঙ্গল চিন্তা করে অমন ভেঙে পড়ে, বুঝলে?

আশাকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–ঠিক বলেছো আশা, আমার মা সব সময় আমার জন্য ভাবেন। তা তত ভাববেনই–মায়ের মন, সে তোমরা বুঝবে না।

ঠিক বলেছো, মায়ের ব্যথা আমরা বুঝতে চাই না। সন্তানের জন্য তাদের যে কত চিন্তা.......মায়ের কথা স্মরণ হতেই বনহুর আনমনা হয়ে যায়।

আশা বুঝতে পারে, তাই কোনো কথা বলে না।

জাভেদ তখন দূরবীক্ষণে দৃষ্টি রেখে দূরে পুলিশ বাহিনীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলো।

মিঃ জাফরী দলবলসহ সমস্ত জঙ্গল চষে ফিরলেন তবু বনহুরের বা তার সঙ্গীর কোনো সন্ধান পেলেন না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এদিকে।

মিঃ জাফরী ফিরে যাওয়ার জন্য তার সহকারীদের এবং পুলিশ বাহিনীকে প্রস্তুত হতে বললেন।

জঙ্গলের এক নিভৃত জায়গায় পুলিশ ভ্যানগুলো স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিলো। প্রত্যেকটা ভ্যানে একটা পুলিশ ড্রাইভার প্রতীক্ষা করছিলো। কখন কোন মুহূর্তে গাড়ি ছাড়তে হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, কাজেই তারা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসলেন মিঃ জাফরী দলবলসহ ভ্যানগুলোর পাশে। সন্ধ্যার পূর্বেই তারা ফিরে যাবেন জঙ্গল পেরিয়ে, এই ছিলো তার ইচ্ছা কিন্তু তা হলো না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে আসতেই গাড়িতে চেপে বসলেন।

সম্মুখ গাড়িতে মিঃ জাফরী এবং তার সহকারীরা।

পিছনের ভ্যান দুটিতে পুলিশ বাহিনী।

পুলিশ ভ্যানগুলো জঙ্গল পেরিয়ে এগুতে লাগলো। আগাছা আর ঝোঁপঝাড় অতিক্রম করে পথ বেছে নিতে হচ্ছে বলে ধীরে ধীরে এগুতে হচ্ছে গাড়িগুলোকে।

পুলিশ অফিসার এবং পুলিশ বাহিনীর সবার মুখমণ্ডলই মলিন বিষণ্ন মনে হচ্ছে। হতাশায় ভরে উঠেছে সকলের মন, এত পরিশ্রম তাদের বিফল হলো। যদিও মিঃ জাফরী নিজেও জানতেন দস্যু বনহুরকে খুঁজে বের করা সহজ ব্যাপার নয়, তবু তিনি তাকে পাকড়াও করার জন্য বদ্ধপরিকর। সে কারণেই তিনি কান্দাই জঙ্গলের দুর্গম পথে রওনা দিয়েছিলেন।

সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হওয়ায় মিঃ জাফরী খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তিনি ভ্যানে বসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলেন চারিদিকে।

জঙ্গলের অভ্যন্তর অতিক্রম করে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে ভ্যানগুলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা বিরাট বাঘ আকস্মাৎ লাফিয়ে পড়লো সম্মুখের ভ্যানটার উপর।

ঐ ভ্যানে ছিলেন মিঃ জাফরী স্বয়ং।

তিনি দিশেহারা হয়ে গুলী ছুঁড়তে লাগলেন কিন্তু বাঘটা এমনভাবে আক্রমণ করলে, পুলিশ অফিসারগণ কিছুতেই বাঘটার কবল থেকে রক্ষা পেলেন না– কারও হাতে, কারও বুকে বা পিঠে বাঘটা নখ বসিয়ে দিলো।

কে কোন্ দিকে ছুটে পালাবেন পথ পাচ্ছেন না মিঃ জাফরী বয়সী, তার স্থুলদেহ, কাজেই তিনি গাড়ি থেকে দ্রুত নামতে পারছেন না, পড়ে গেলেন গাড়ির মধ্যে মুখ থুবড়ে।

বাঘটা তাকেই আক্রমণ করলো।

বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে এসে এমন বিপদ ঘটবে তারা ভাবতে পারেননি। ভেবেছিলেন সন্ধ্যার পূর্বে তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসবেন এবং গাড়ি দ্রুত চলাকালে হিংস্র জীবজন্তু আক্রমণ করতে পারবে না তখন।

পুলিশ ভ্যানগুলো জঙ্গল অতিক্রম করলেও একেবারে জঙ্গলের বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি, জঙ্গলের কাছাকাছি কিছুটা ফাঁকা জায়গা ধরে পুলিশ ভ্যানগুলো এগুচ্ছিলো। মিঃ জাফরী ও অন্যান্য অফিসার ছিলেন সম্মুখ ভ্যানে।

তারা লক্ষ্য করছিলেন আশেপাশে, সেই সময় বাঘটা আচম্বিতে লাফিয়ে পড়েছিলো ভ্যানটার উপরে।

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার গাড়ি থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যায়।

গাড়ি তিনটা এলোমেলোভাবে থেমে পড়ে এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী কে কোন্ দিকে ছিটকে পালায়। কেউ বাঘটার প্রতি গুলী ছুঁড়তে সাহসী হয় না, কারণ পুলিশ অধিনায়কগণ ছিলেন প্রথম ভ্যানটাতে। বাঘটাকে গুলী করলে যদি গুলী এসে বিদ্ধ হয় কোনো পুলিশ প্রধানের শরীরে, তাই তারা এ ব্যাপারে ক্ষান্ত হয়।

মিঃ জাফরী অসহায়, আজ তার মৃত্যু অনিবার্য, কারণ বিরাটদেহী বাঘটা ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে তাকে।

সে এক চরম অবস্থা।

মিঃ জাফরী মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। আর পেরে উঠছেন না তিনি, মরিয়া হয়ে বাঘটার আক্রমণ থেকে নিজকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জঙ্গলের ভিতর থেকে গুলী এসে বিদ্ধ হলো বাঘটার শরীরে। বাঘটা ততক্ষণে মিঃ জাফরীর বাম হাতে এবং কাঁধে ভীষণভাবে থাবা বসিয়ে দিয়েছিলো।

বাঘটার শরীরে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় বাঘটা তীব্র এবং ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে উঠে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায় মিঃ জাফরীর পাশে পুলিশ ভ্যানটার মধ্যে।

পিছনে ভ্যানগুলোর আলোতে সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। বাঘটার ঠিক কাঁধে গুলী বিদ্ধ হয়েছিলো এবং তৎক্ষণাৎ বাঘটা লুটিয়ে পড়লো ভ্যানটার মধ্যে।

বাঘটা মুখ থুবড়ে পড়তেই মিঃ জাফরী অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন।

ততক্ষণে অন্যান্য পুলিশ অফিসার ও পুলিশ বাহিনীর সবাই ভয়বিহ্বল পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন মিঃ জাফরীর পাশে। তারা সবাই ঘিরে ধরলেন কিন্তু কারও মুখে কোনো কথা নেই। মিঃ জাফরীর অবস্থা দেখে সবাই যেন হতবাক হতভম্ভ বনে গেছেন।

মিঃ জাফরীর কাধ এবং বাহু দিয়ে রক্ত পড়ছে ভীষণভাবে।

মিঃ জাফরী বললেন–আপনারা হা করে কি দেখছেন? শিগগির চলুন,.. এখানে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করা উচিত হবে না।

পুলিশ বাহিনী বেকুফ বনে গেছে, সবাই যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে, কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

একজন পুলিশ অফিসার বললেন–আর একদণ্ড বিলম্ব করা উচিত হবে না, তাড়াতাড়ি চলুন।

ভ্যানগুলোর ড্রাইভার আসনে উঠে বসলো ড্রাইভার। যতদূর সম্ভব গাড়িগুলো দ্রুত ছুটে চললো শহর অভিমুখে।

*

মিঃ জাফরী কয়েক দিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলেন। তিনি জীবনে বেঁচে গেছেন এটা যেন তার পরম সৌভাগ্য, কারণ সেদিন তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিলেন। হঠাৎ ঐ মুহূর্তে বাঘটাকে লক্ষ করে যদি গুলি না আসতো তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য ছিলো। কিন্তু কে ঐ মুহূর্তে বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী। ছুঁড়েছিলো আজও তিনি জানেন না।

মিঃ জাফরী সুস্থ হবার পর তিনি ডাকলেন সেদিন যে অফিসাররা তার সঙ্গে কান্দাই জঙ্গলে গিয়েছিলেন তাদেরকে। তার বড় ইচ্ছা জানার কে তিনি যিনি বাঘটাকে হত্যা করেছেন।

অফিসারগণ সবাই এলেন যারা সেদিন মিঃ জাফরীর সঙ্গী ছিলেন।

মিঃ জাফরী অফিসারগণকে সম্মান দেখিয়ে বসতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন–দেখুন, আজ আমি জীবিত আছি শুধু আপনাদের সহায়তায়, কারণ আপনাদের মধ্যে একজন বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী না ছুড়লে আমি ঐ দণ্ডে রক্ষা পেতাম না। কিন্তু আমি জানতে চাই কে তিনি যিনি আমাকে এভাবে রক্ষা। করতে সক্ষম হলেন?

পুলিশ অফিসারগণ এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিয়ে একজন বললেন–স্যার, আমরা কেউ ঐ মুহূর্তে বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে সাহসী হইনি, কারণ গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আপনার দেহে বিদ্ধ হতে পারে!

বলেন কি, আপনারা তাহলে গুলী ছোড়ননি!

অপর একজন বললেন–স্যার, আমাদের সুযোগ আসেনি।

তবে কি পুলিশ বাহিনীর কেউ আমাকে এই ভয়ঙ্কর মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে। হয়তো তাই। হবে..... আপনারা তাদের ডাকুন যারা সেদিন আমাদের সঙ্গে কান্দাই জঙ্গলে গিয়েছিলো।

কিছু সময়ের মধ্যেই এলো পুলিশ বাহিনীর সেই জোয়ানরা, যারা সেদিন বনহুর ও জাভেদের সন্ধানে মিঃ জাফরীর সঙ্গী হিসেবে গিয়েছিলো।

মিঃ জাফরী তাদের সবাইকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন–তোমাদের মধ্যে কে সেই যমদূত বাঘটাকে হত্যা করেছো? বলল আমি তাকে পুরস্কৃত করবো।

পুলিশ বাহিনীর জোয়ানরা সবাই মুখ চাওয়া চাওয়ি করে মাথা নিচু করলো।

পুলিশ অফিসারগণ মনে করেছিলেন নিশ্চয়ই কোনো পুলিশ বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলো কিন্তু এখন বুঝতে পারলেন পুলিশগণ গুলী ছোড়নি।

একজন পুলিশ অফিসার বাহিনীর জোয়ানদের লক্ষ্য করে বললেন– বলো তোমরা কে সেই বাঘটাকে গুলীবিদ্ধ করেছিলে?

জোয়ানরা বলে উঠে–স্যার, আমরা কেউ গুলী ছুঁড়িনি।

মিঃ জাফরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন–তোমরাও গুলী ছোড়নি?

না স্যার। বললো একজন পুলিশ বাহিনীর জোয়ান।

তারপর সবাই একসঙ্গে বলে উঠে–স্যার, আমরা সবাই সুযোগ খুঁজে ছিলাম কিন্তু গুলী ছুড়বার সাহস পাইনি।

সেই একই কথা যে কথা বলেছিলেন পুলিশ অফিসাররা। তবে কে বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলোর সবার মনে ঐ একই প্রশ্ন।

মিঃ জাফরী গম্ভীর হয়ে পড়েছেন।

অন্যান্য পুলিশ অফিসার সবাই স্তম্ভিত হতবাক, কে তবে বাঘটাকে ঐ মুহূর্তে গুলী করেছিলো?

মিঃ জাফরী কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন, তারপর বললেন–বাঘটাকে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করেছে কে তা আমি বুঝতে পেরেছি।

সবাই প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে ধরে মিঃ জাফরীর মুখের দিকে। কে তবে বাঘটাকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়েছিলো। কে সে? পুলিশ অফিসাররা।

মিঃ জাফরী বললেন– দস্যু বনহুর ছাড়া কারও সাধ্য ছিলো না ঐ মুহূর্তে বাঘটাকে হত্যা করে, কারণ আমি জানি তার অসাধ্য কিছু নেই।

সবার চোখেমুখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে, বলেন কি মিঃ জাফরী, যাকে তারা গ্রেপ্তার করতে গেছেন সেই ব্যক্তিই হিংস্র বাঘের কবল থেকে রক্ষা করলে তাদেরকে, এমন কথা তারা কোনোদিন শোনেননি বা কোনোদিন দেখেননি।

সমস্ত পুলিশমহলে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো।

সবার মুখে একই কথা–দস্যু বনহুর মিঃ জাফরীকে ভয়ঙ্কর এক বাঘের কবল থেকে রক্ষা করেছে।

কথাটা শুধু মুখে মুখেই রইলো না, সাংবাদপত্রে ছাপা হলো এবং মিঃ জাফরী দুস্য বনহুরকে পুরস্কার দেবেন বলেও সংবাদ দিলেন। এক কিংবা দু'হাজার টাকা নয়, বিশ হাজার টাকা!

সংবাদপত্র এক সময় পৌঁছলো মনিরার হাতে।

মনিরার মনে নানা প্রশ্ন উদয় হচ্ছে, কে সেই বালক এবং কে বনহুরের সঙ্গী ছিলো সেই কান্দাই জঙ্গলে? মনিরা জানে বনহুর যখন মুক্ত হয়েই গেছে তখন নিশ্চয়ই সে আসবে, যেমন করে হোক দেখা করবেই তার সঙ্গে।

বারবার অভিমানে চোখ দুটো ছলছল করছিলো তার, একটা সন্দেহের ছায়া তার মনে আচ্ছন্ন করে ফেলছিলো। সে প্রতি মুহূর্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলো।

শুধু মনিরাই নয়, মরিয়ম বেগমও সেই দিনের পর থেকে অবিরত নামাজ পড়ে দোয়া করছিলেন যেন তার সন্তান মুক্ত হয়ে ফিরে আসে। সংবাদপত্রে পুত্রের মুক্তিসংবাদ পেয়ে মরিয়ম বেগমের আনন্দ অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

সরকার সাহেবও শুনে খুশি হলেন অনেক। বাড়ির চাকর বাকর সবাই খুশি হয়েছে, কারণ তাদের বাড়ি থেকেই এবার ছোট সাহেব গ্রেপ্তার হয়েছিলো, তাদের মনেও স্বস্তি ছিলো না।

বনহুরের যারা অনুগ্রহপ্রার্থী তারা সবাই আনন্দিত হয়েছে। খুশি যেন ধরছে না তাদের, কারণ দস্যু বনহুর শুধু তাদের দানই করে না, তাদের প্রতি বনহুরের আছে অসীম স্নেহ–ভালবাসা। যখনই দুঃস্থ জনগণ কোনো না কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়, তখনই বনহুর এসে হাজির হয় তাদের পাশে।

কান্দাইয়ের জনগণই শুধু নয়, যে কোনো দেশেই বনহুর যখন গেছে তখন সেখানের অসহায় মানুষের জন্য সে সংগ্রাম করেছে, নিপীড়িত জনগণের জন্য করেছে সে অনেক কিছু। কেমন করে তারা বনহুরকে ভুলবে বা ভুলতে পারবে!

সংবাদপত্রে এবং রেডিওতে যখন বনহুর সম্বন্ধে তারা কোনো দুঃসংবাদ শুনতে পায় তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, আর যখন জানতে পারে বনহুর সম্বন্ধে কোনো সুসংবাদ, তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সবাই। বনহুর তাদের যেন কত আপন জন!

মিঃ জাফরী যখন বনহুরকে চৌধুরীবাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করেন তখন শহর এবং গ্রামঞ্চলের বহু লোক দুঃখ আর ব্যথায় ভেঙে পড়েছিলো সংবাদটা শুনে। আবার যখন তারা শুনলো বা জানতে পারলো বনহুর হাঙ্গেরী কারাগার থেকে উধাও হয়েছে তখন তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিলো। এক অপূর্ব অনুভূতি আলোড়ন দুঃস্থ অসহায় মানুষের মনে।

মিঃ জাফরী যিনি বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য অহরহ বদ্ধপরিকর, সেই বিশ্ববিখ্যাত পুলিশ অধিনায়কও আজ বনহুরের প্রতি অনুরাগী। মুখে কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ না করলেও তার অন্তর আজ কৃতজ্ঞতায় ভরপুর।

মিঃ জাফরী নির্বাক হয়ে গেছেন যে, তিনি এই ঘটনার পর সব সময় আনমনা হয়ে ভাবেন। কি ভাবেন কেন ভাবেন তা যেন তিনি নিজেই বোঝেন না। …… যে বনহুরকে তিনি পেলে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হবেন না, যে বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারলে তাকে লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে তিনিই প্রচার করে দিয়েছেন, সেই বনহুর তাকে সদ্যমৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়ে নিয়েছে, এ যেন তার জীবনের এক অভিনব ব্যাপার।

সেদিন মিঃ জাফরী তার শয়নকক্ষের বেলকুনিতে বসে নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সূর্যের লালছে আভার ঝামগাছের সোনালী পাতাগুলো ঝলমল করছে যেন। শুভ্র বলাকাগুলো ডানা মেলে ফিরে চলেছে নিজ নিজ বাসায়। মিঃ জাফরী সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, এমন সময় পেছনে কারও পদশব্দ শুনে ফিরে তাকান তিনি।

ভীষণভাবে চমকে উঠলেন মিঃ জাফরী।

সহসা মুখ দিয়ে তার কোনো কথা বের হলো না।

এগিয়ে এলো আগন্তুক, শান্তকণ্ঠে বললো–পুলিশ অধিনায়ক, আপনি কেমন আছেন?

মিঃ জাফরী ঢোক গিলে বললেন–তুমি!

হাঁ, আমি এসেছি।

বনহুর, সত্যি তুমি মহৎ…….

আপনার মুখে এ কথা শুনবো আশা করিনি। তা কেমন আছেন আপনি?

ভাল। আমি ভাল আছি বনহুর।

আপনার ক্ষতগুলো শুকিয়ে গেছে?

হাঁ, সত্যি তোমার গুলী যদি সেদিন ব্যর্থ হতো তাহলে মৃত্যু আমার অনিবার্য ছিলো। বনহুর, তুমি অপেক্ষা করো, আমি তোমাকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার স্বরূপ দেবো।

পুরস্কার!

হাঁ, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো, তাই তোমাকে আমি এই টাকা দেবো বনহুর।

পুলিশ অধিনায়ক, আপনার জীবনের মূল্য কি বিশ হাজার?

বনহুর, যে উপকার তুমি করেছো জানি তার মূল্য হয় না। তবু আমি তোমাকে এই সামান্য টাকা দিতে চাই....

আপনার প্রস্তাবে সম্মত আছি তবে টাকা আমি গ্রহণ করতে চাই না, ঐ টাকা আপনি কোনো দুঃস্থ ব্যক্তিকে দান করে দেবেন তাহলেই আমি খুশি হবো।

বনহুর!

হা মিঃ জাফরী!

সত্যি বলছো?

হাঁ, তাই দেবেন। একটু থেমে বললেন বনহুর কিন্তু আজ কেন এসেছি এ কথা এখনও বলা হয়নি। মিঃ জাফরী, কিছুদিন পূর্বে হিন্দল বন্দর থেকে যে ক'জন চোরাকারবারীকে পুলিশমহল গ্রেপ্তার করেছিলেন স্মরণ আছে?

হা আছে।

শুনেছি তারা অচিরেই মুক্তি পাচ্ছে?

হাঁ।

কারণ গ্রেপ্তারের পর জানা গেছে তারা দেশের হর্তাকর্তাদেরই পরম আত্নীয় লোক, কাজেই তারা মুক্তি। পাবার যোগ্য ব্যক্তি, নয় কি?

মিঃ জাফরী গম্ভীর কন্ঠে বললেন–হয়তো ঐ রকমই হবে।

শুনুন, যত পরম আত্নীয়–বন্ধুই হোক তারা, মুক্তি পেলে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাবে না, কারণ তারা শুধু জনগণের শত্রু নয়, তারা দেশের শত্রু, এ ভুলে যাবেন না কোনো সময়। বিচার তাদের হতেই হবে। শেষ কথাটা দাতে দাঁত পিষে বললো বনহুর।

মিঃ জাফরী আজ বনহুরের কথায় ক্রুদ্ধ হতে পারলেন না বরং তিনি নরম গলায় বললেন,–দেশে শাসনকর্তাগণ যদি হুকুম করেন তাহলে আমরা বাধ্য হবো তাদের মুক্তি দিতে। তবে আমি নিজেও জানি এটা চরম অপরাধ.....

তবু আপনারা তা মেনে নেবেন?

দেখো বনহুর, তুমি এসব ব্যাপার জানো না বলেই....

এমন কথা বলছি, তাইনা? .....

তা ঠিক নয়.... আমি কি বলতে চাইছি জানো, যতই যা বল..

মিঃ জাফরীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো বনহুর–হর্তাকর্তাদের আদেশ আপনাদের মেনে চলতেই হবে, কি বলেন?

কারণ আমরা চাকরি করি!

চাকরি করেন বলেই মেনে নেবেন অন্যায়কে?

প্রতিবাদ করেছিলেন কয়েকজন এদের মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে।

তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে,....

তুমি এত সংবাদ রাখো?

মনে রাখবেন আমি আপনাদের হাড়ির সংবাদ রাখি। যাক, কাজের কথায় আসা যাক। এভাবে পুলিশ প্রধানের কক্ষের বেলকুনিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, হঠাৎ কোন দিক থেকে পুলিশ ফোর্স এসে পড়বে তা বলা যায় না। বন্দী হবার সময় আপাতত নেই, কারণ হাতে অনেক কাজ আছে। শুনুন মিঃ জাফরী, এইসব

চোরাকারবারীরা যদি মুক্তি পায় তবে আপনাকে তার জবাব দিহি করতে হবে। এখন বিদায় নিচ্ছি ….. কথাটা বলে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলো বনহুর মিঃ জাফরীর সঙ্গে, তারপর বেরিয়ে গেলো সে যেমন এসেছিলো তিনি দ্রুত পদক্ষেপে!

বাইরে শোনা গেলো মোটর স্টার্টের শব্দ।

মিঃ জাফরী তখন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। দস্যু বলে যাকে এতদিন তিনি ঘৃণা করে এসেছেন আজ তার প্রতি একটা বিশ্বাস ও সহানুভূতি জাগলো তার মনে। তিনি যত ভাবছেন বনহুরের কথা ততই যেন অভিভূত হচ্ছেন।

এমন সময় এলেন কান্দাই নতুন পুলিশ সুপার। তিনি দেখা করতে এসেছেন মিঃ জাফরীর সঙ্গে। দস্যু বনহুরকে নিয়ে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করছেন পুলিশ অফিসারগণ। কিভাবে তাকে এবং তার সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করা হবে, এ নিয়েই পরামর্শ করতে এসেছেন মিঃ কায়েসী।

মিঃ জাফরী যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসে আছেন, এমন সময় কান্দাই পুলিশ সুপার মিঃ কায়েসী এলেন এবং গুড় ইভনিং জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন।

মিঃ জাফরীর মুখ শান্ত, গম্ভীর। একটা প্রসন্ন ভাব ফুটে আছে তার চোখেমুখে। মিঃ কায়েসীও হঠাৎ কিছু বলতে পারছেন না। কারণ মিঃ জাফরীই তাকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মিঃ কায়েসের সঙ্গে পরামর্শ করেন কিভাবে কি করা যাবে। কিন্তু এখানে মিঃ জাফরীকে নীরব থাকতে দেখে মিঃ কায়েসী চুপ রইলেন।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো মিঃ জাফরী তবু কোনো কথা বলছেন না, তিনি নীরবে সিগারেট পান করে চলেছেন।

মিঃ কায়েসী একটু কেশে নিয়ে বললেন–স্যার, আমি এসেছি…….

হাঁ, দেখতে পাচ্ছি।

স্যার!

বলুন?

বনহুরের ব্যাপারে যে আলোচনা ছিলো…

হাঁ ছিলো। কয়েকমুখ ধোয়া ছেড়ে বলেন মিঃ জাফরী–যে ব্যাপারে আপনাকে ডেকেছিলাম সে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে মিঃ কায়েসী।

স্যার………বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠেন মিঃ কায়েসী।

মিঃ জাফরী এতক্ষণ বসেছিলেন, তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যান রেলিংয়ের পাশে, দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্যই আপনাকে ডেকেছিলাম, তাই নয়

হা স্যার।

কিন্তু সে ব্যাপারে আর আমার কোনো উৎসাহ নেই এবং কেন নেই, এ কথা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না!

স্যার, আপনি তবুও এ ব্যাপারে……

ছিলাম কিন্তু আর এখনই নেই।

কিন্তু…

দস্যু হলেও আমাদের সভ্যজগতের অনেকের চেয়ে সে অনেক বড় এবং মহৎ মিঃ কায়েসী। একদিন আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম। আজ আমি ক্লান্ত পথিকের মত শান্ত হয়ে পড়েছি। কথাগুলো বলে আসন গ্রহণ করলেন মিঃ জাফর।

মিঃ কায়েসী স্থিরনয়নে তাকিয়ে থাকেন মিঃ জাফরীর মুখের দিকে।

সেদিন থেকে মিঃ জাফরী সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে পড়লেন। বনহুরকে যিনি সব সময় শত্রু মনে করতেন সেই বনহুরে কথা ভাবতে আনন্দবোধ করেন এখন মিঃ জাফরী।

মিঃ জাফরীর এ পরিবর্তনে পুলিশমহলে অনেকেই ভিতরে ভিতরে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতে লাগলেন। অবশ্য এরা মিঃ জাফরীর কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবেন না, তবু একটা আক্রোশ দানা বেঁধে উঠতে লাগলো তাদের মনে।

একটা দস্যুর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া একজন পুলিশ প্রধানের পক্ষে অপরাধজনক কাজ তাতে কোনো ভুল নেই, কাজেই এ ব্যাপার উপরওয়ালাদের কানে গিয়ে পৌঁছলো।

একদিন মিঃ জাফরীর ডাক পড়লো কান্দাই অধিনায়ক মিঃ হার্নিংসো বার্ডের অফিসে। সেখানে আরও অন্যান্য কর্মকর্তা কয়েকজন ছিলেন।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড ভীষণ রাগী এবং স্বার্থপর। অন্যান্য কর্মকর্তার সাহায্যে তিনি বহু অর্থ এবং সম্পদ নিজের করে নিয়েছেন। যদিও তিনি বহুদিন হলো কান্দাই অধিপতি হন নি, তার শাসনকাল মাত্র কয়েক বছর। এরি মধ্যে তিনি এমনভাবে কান্দাইবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছেন যার জন্য তার কথা অমান্য করে এমন সাহস কারও ছিলো না।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড পুলিশ অধিনায়ক মিঃ জাফরীকে যখন ডেকে পাঠালেন তখন তিনি প্রথমে হকচকিয়ে গেলেন, যদিও তার মনে কোনো ভীতিভাব জাগেনি। তিনি বুঝতে পারলেন কেন কান্দাই। অধিনায়ক তাকে ডেকেছেন।

তিনি হাজির হলেন মিঃ হানিংসো বার্ডের সম্মুখে।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড প্রথমেই মিঃ জাফরীকে কৈফিয়ৎ তলব করলেন– মিঃ জাফরী, শুনলাম আপনি নাকি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন?

মিঃ জাফরী গম্ভীর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন–শুধু উদাসীন নই স্যার, আমি এ ব্যাপারে অক্ষম।

একটা দস্যুর প্রতি আপনার এতখানি সহানুভূতি থাকা মোটেই সমীচীন নয়। যদিও দস্যু আপনার জীবন রক্ষা করেছিলো একটা হিংস্র বাঘ হত্যা করে। তার মূল উদ্দেশ্য আপনার জীবন রক্ষা নয়, বাঘটাকে হত্যা করা। আর আপনি মনে করেছেন অন্যরকম…

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন–আমি যাই মনে করি না কেন বা সে যে উদ্দেশ্যই হিংস্র বাঘটাকে হত্যা করুক না কেন, ঐ মুহূর্তে বাঘটাকে হত্যা না করলে আমি আপনার ডাকে এখানে আসতে পারতাম না।

কাজেই আপনি দস্যুটার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েছেন বিদ্রূপভরা কণ্ঠে কথাগুলো বললেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড।

মিঃ জাফরী বললেন–কৃতজ্ঞতাবোধ আমার আছে, কাজেই আমি আপনার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিলাম।

আপনি তাহলে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে উৎসাহী নন?

আমি আপনার শেষ কথা?

হা।

আপনি ভুল করছেন মিঃ জাফরী, দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারের ব্যাপারেই আজ আপনার এত সুনাম। একবার বা দু'বার নয়, আপনার প্রচেষ্টায় দস্যু বনহুর কয়েকবার গ্রেপ্তার হয়েছে।

কিন্তু বারবার আমি বিফলকামই হয়েছি তার কাছে।

সে আপনার বিফলতা নয় মিঃ জাফরী। দস্যু বনহুরকে আপনি গ্রেপ্তার করেছেন ঠিক কিন্তু তাকে আটকে রাখা সম্ভব হয়নি–সে ত্রুটি সমস্ত পুলিশ মহলের।

স্যার, আমি ক্লান্ত, আমি অবসন্ন, কাজেই আমি অবসর চাই।

মিঃ জাফরী, এ আপনি কি বলছেন?

হা স্যার, বয়স হয়েছে, আর আমি পারছি না, এবার অবসর গ্রহণ করতে চাই।

এবার মিঃ হার্নিংসো বার্ড নীরব হয়ে গেলেন, কারণ তিনি মনে করেছিলেন চাকরি রক্ষার্থে মিঃ জাফরী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার ব্যাপারে পুনরায় উৎসাহী হয়ে উঠবেন, কিন্তু মিঃ জাফরীর মুখে চাকরি সম্বন্ধে অবসর গ্রহণের কথা শুনে হার্নিংসো বার্ড যেন কিছুটা দমে গেলেন। তবু তিনি ক্ষমতার ব্যবহার করলেন, বললেন–দস্যু বনহুর যত উপকারই করুক তবু অপরাধী, কাজেই তার প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া চরম অপরাধ।

এ কথা জেনেও আমি অক্ষম স্যার! উঠে দাঁড়ালেন মিঃ জাফরী। তিনি দরজার দিকে পা বাড়াতেই মিঃ হার্নিংসো বার্ড বললেন–শুনুন।

এরপর আমার কোনো কথা শুনবার নেই স্যার। কথাটা বলে দ্রুত পদক্ষেপ বেরিয়ে গেলেন মিঃ জাফরী।

মিঃ হার্নিংসো বার্ডের চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ হয়ে উঠলো, মিঃ জাফরীর এমন আচরণ তার কাছে অসহ্য লাগলো। মিঃ হানিংসো বার্ডের পাশেই ছিলেন অপর একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা, তিনি এতক্ষণ নিশ্চুপ শুনছিলেন সবকিছু।

মিঃ হার্নিংসো বার্ডের মনোভাব বুঝতে পেরে কর্মকর্তাটা বলে উঠলেন–স্যার, মিঃ জাফরীর এ ব্যবহার আপনার সম্মুখে ভীষণ দূষণীয়। আজ পর্যন্ত এমন কোনো ব্যক্তি নেই যিনি আপনার মুখের উপর এমন ধরনের উক্তি উচ্চারণ করেছেন। স্যার, মিঃ জাফরীকে এ ব্যাপারে শাস্তি দেওয়া দরকার। মিঃ হার্নিংসো বার্ড বললেন–কি শাস্তি দেয়া যেতে পারে? চাকরি থেকে তাকে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ছিলো কিন্তু তিনি নিজেই চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

বললেন বিশিষ্ট কর্মকর্তাটা–স্যার, চাকরি গেলেও তার তেমন কোনো ক্ষতি ছিলো না বা হবে না, কারণ মিঃ জাফরীর বাড়ির অবস্থা মন্দ নয়, তাছাড়াও তার সংসারে কোনো অভাব নেই।

আপনিই বলুন তাকে কি শাস্তি দেওয়া যেতে পারে? মিঃ হার্নিংসো বার্ড তাকালেন তার পার্শ্বস্থ কর্মকর্তাটার দিকে।

তিনি বললেন–মিঃ জাফরীকে আটক করেন। তিনি দস্যু বনহুরের প্রতি সহানুভূতিশীল, এটাই তার অপরাধ।

হাঁ, তাই হবে! বললেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড। একটু থেমে বললেন তিনি–মিস্টার, আপনার বন্ধুপুত্রটি এখনও আটক আছে না ছাড়া পেয়েছে?

স্যার, অসময়ে এখানে এসেছি শুধুমাত্র ঐ কারণেই, আমার বন্ধুপুত্রটাকে বিনা অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সে নিজস্ব কিছু মাল নিয়ে চালান দিচ্ছিলো সীমান্তের ওপারে। ছোটোখাটো ব্যবসা, এ এমন আর কি দুষণীয় বলুন স্যার?

মিঃ হার্নিং বললেন–কত টাকার মালামাল ছিলো ঐ জাহাজে?

সামান্য স্যার, মাত্র দু'কোটি টাকার মালামাল ছিলো।

হু।

দেখুন স্যার, বন্ধুপুত্র এর পূর্বে তিন কোটি টাকার পণদ্রব্য সীমান্তের ওপারে ব্যবসা করে বেশ মোটা অংশ পেয়েছিলো, তখন স্যার আপনার স্ত্রীকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার একটা.....

ও ঐ নেকলেসটা বুঝি আপনার বন্ধুপুত্র দিয়েছিলো?

হাঁ স্যার।

আমার স্ত্রী খুব খুশি হয়েছিলেন।

এবার যদি তার মাল এবং তাকে আটক করা না হতো নিশ্চয়ই সে ভাল কিছু উপহার নিয়ে আসতে আপনার স্ত্রীর জন্য।

ওকে আর বেশি লাই দেবেন না আপনারা।

স্যার, কার কথা বলছেন?

আমার স্ত্রী মনে আপনার বৌদির কথা বলছি। জানেন মিষ্টার আজকাল সব সময় লোকজন আপনার বৌদির পাশে ভিজ জমিয়ে থাকে।

কেন? কেন স্যার?

এই কথাটাই বুঝতে পারলেন না?

না স্যার।

আমার কাছে আসার প্রয়োজন বোধ করে না তারা। বৌদিই তাদের প্রয়োজন মেটান, তবে হাঁ, আমাকে আসল কাজ করে দিতে হয়। এখন বুঝতে পেরেছেন তো?

স্যার, এখনও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না।

ও, আপনাকে দেখছি সব খুলে বলতে হবে।

বলুন স্যার?

একমুখ হেসে বললেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড–একটু পূর্বেই আপনি বললেন না যে আপনার বন্ধুপুত্র তার মাসীমাকে একছড়া নেকলেস উপহার দিয়েছে….. বলে আবার হাসলেন, হেসে বললেন–তেমনি সবাই ভিড় করে আজকাল আপনার বৌদির চারপাশে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ ভিড় চলে।

স্যার, কি রকম পান বৌদি?

ও কথা আমাকে বলবেন না, তাকেই বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করে আসবেন। আমি তো দেখতে পাচ্ছি বাড়ির উঠান থেকে অন্তপুর পর্যন্ত আজকাল পা রাখার ঠাই পাই না।

সত্যি সার?

হাঁ মিষ্টার,হা একদিন নিজে গিয়ে দেখে আসবেন।

স্যার, কিছুদিন আগেও আপনি আর দশজনের মত ছিলেন। কিন্তু আজ আপনি শুধু কান্দাইয়ের শাসনকর্তাই নন, আপনি মহারাজা।

ঠিক বলেছেন মিষ্টার, আপনারাই আমাকে মহারাজ বানিয়েছেন। কি বলে যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাবো। একটা তৃপ্তিদায়ক দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড–এ জন্য আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্যার, বেশি বাড়িয়ে বলছেন, আপনার ছায়াতলে আমরা আশ্রয় পেয়েছি বলেইনা বেঁচে আছি। নগণ্য মানুষ আমরা, তবু আপনার দয়ায় আজ কান্দাইয়ের মহান অধিপতিদের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। শুধু সম্মানই পাইনি, পেয়েছি অফুরন্ত টাকা–পয়সা–ঐশ্বর্য। আজ আমরা সত্যি সুখী….. এ জন্য আপনাকেই আমরা ধন্যবাদ জানাই স্যার!

বলুন?

আমার বন্ধুপুত্রটাকে আটক করা হয়েছে, তাই আমি এসেছিলাম যদি কিছু করা যায়।

ও! শুধু আপনিই নন মিষ্টার, অনেকজনই এলেন। এ পর্যন্ত তারা সবাই এসেছেন একই ব্যাপারে। আমি হুকুম দিয়েছিলাম দেশ থেকে চোরাকারবারী আর দুস্কৃতিকারী উচ্ছেদ অভিযান চালান। চালানো হলো, ধরপাকড় চললো, গ্রেপ্তার হলে অনেকে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সবাই আমাদের লোক। দেখুন মিষ্টার লজ্জায় আমার মাথা হেট হয়ে যাচ্ছে, দেশবাসীর কাছে আমি বড় বলেছিলাম দেশ থেকে আমি অসৎ ব্যক্তিদের নির্মূল করবো কিন্তু.....

বলুন স্যার, থামলেন কেন?

আজ আমি জনগণের কাছে লজ্জিত হয়েছি।

স্যার, লজ্জার কিছু নেই, কারণ আপনি নির্দেশ দিলেই সবাই মুক্তি পেয়ে যাবে, তখন জনগণ বুঝতে পারবে তারা সবাই নির্দোষ ছিলো স্যার, আরও এক কাজ করতে হবে, যারা আমাদের লোকজনকে দোষী সাব্যস্ত করে পাকড়াও করেছিলো, তাদের সকলের চাকরি বরখাস্ত করতে হবে, তাহলেই জনগণ বুঝতে পারবে নির্দোষ ব্যক্তিদের মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করার অপরাধে তাদের চাকরি খোয়া গেছে।

হা মিষ্টার, আপনি একটা যুক্তিসঙ্গত পরামর্শই আমাকে দিয়েছেন। শুধু আপনার বন্ধুপুত্র নয়, ভুলবশতঃ যাদের আটক করা হয়েছে, তাদের সবাইকে আমি মুক্তি দেবার নির্দেশ দিচ্ছি।

সত্যি স্যার, আপনার মহত্বের সীমা নেই। কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেবো ভেবে পাচ্ছি না। আপনার সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার জন্য আজ সমস্ত কান্দাইবাসী ধন্য হয়েছে, সবার মুখে আপনার জয়গান। আজ তাহলে চলি স্যার?

হা আসুন। মিঃ হার্নিংসো বার্ড আনন্দদীপ্ত কণ্ঠে কথাটা উচ্চারণ করলেন।

কর্মকর্তাটা চলে যাবার পরও মহান অধিপতির কানে তার কথার সুরের প্রতিধ্বনি হচ্ছিলো... আপনার বুদ্ধিমত্তার জন্য আজ সমস্ত কান্দাইবাসী ধন্য হয়েছে,......সবার মুখেই আপনার জয়গান......সবার মুখেই আপনার জয়গান......সবার মুখেই আপনার জয়গান.....

আপন মনেই বলে উঠেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড–আমি কান্দাইয়ের ভাগ্যবিধাতা। আমার একটা টু শব্দে সমস্ত কান্দাইবাসীর অদৃষ্ট ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে। আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে হাসাতে পারি, কাঁদাতে পারি। আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করছে সমস্ত কান্দাইবাসীর ভবিষ্যৎ.......

মিঃ হার্নিংসো বার্ড যখন এসব ভাবছেন তখন টেবিলে ফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার তুলে নিলে মিঃ হার্নিংসো বার্ড।

শুনতে পেলেন তিনি মিসেস হার্নিংসোর গলা, শোন.... মিঃ জাফর রিজভী এসেছিলেন তার বড় ছেলে যেন মুক্তি পায়......।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড বললেন–মিঃ রিজভী তোমার ওখানে গিয়েছিলেন বলেই তুমি খুশি হয়েছ....

ওপাশ থেকে ভেসে এলো......হ্যালো, শোনো, শুধু উনি এসেছিলেন বলেই আমি খুশি নাই! উনি আমাদের ছোট খোকামনির জন্য এনেছেন একটা টেলিভিশন সেট.....

......ও তাই বলো– তা ও জিনিস তো আমাদের আছে....

রইলোই বা, ওটা থাকবে খোকার ঘরে..

..আবার যদি আর একটা পাও?.....

.... তাহলে প্রত্যেকটা ঘরে একটা করে টেলিভিশন হলে খুশি হও?

.... কে না খুশি হয় বলো......

হাসলেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড, তুপ্তির সে হাসি, আনন্দের সে হাসি।

*

আমার জাভেদকে তুমি কোথায় রেখে এসেছো বলো? জবাব দাও নইলে তোমাকে ছাড়ছি না বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে বলে নুরী।

বনহুর মৃদু হেসে বলে–তোমার জাভেদ হারিয়ে যায়নি, তাকে ঠিক পাবে।

কিন্তু সে কোথায়?

বলবো না।

না, তোমাকে বলতে হবে।

তুমি বিশ্বাস করবে তো?

নিশ্চয়ই, বিশ্বাসযোগ্য হলে করবো।

আশার ওখানে।

আশার ওখানে আছে আমার জাভেদ

হাঁ

সত্যি বলছো?

জানো তো সহজে মিথ্যা আমি বলি না।

হুর, আশার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু একবার নয়, বহুবার সে উদ্ধার করেছে তোমাকে, উদ্ধার করেছে আমাকে, তারপর উদ্ধার করলো আমাদের জাভেদকে।

হাঁ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

একটা কথা আমায় বলবে হুর

বলো কি কথা?

যদি সত্যি করে বলো তাহলে বলি। হুর, আমাকে স্পর্শ করে শপথ করো সত্যি কথা বলবে?

বললাম তো, বলবো।

আচ্ছা, আশা তোমাকে ভালবাসে জানি আর সেই কারণেই সে তোমাকে নানা বিপদ থেকে নিজের জীবন বিপন্ন করে উদ্ধার করে..... জবাব দাও তুমি তাকে ভালবাসো?

বড় কঠিন প্রশ্ন করেছে নূরী।

আমি বলেছি সত্যি করে জবাব দেবে?

হু! ......একটা শব্দ করলো বনহুর, তারপর মুক্ত গবাক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো। দূরে পর্বতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো–কেউ যদি কাউকে ভালবাসে তাকেও ভালবাসতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।

ভূমিকা রেখে সঠিক জবাব দাও?

আমি তো বললাম।

বিশ্বাস করি না, তুমি নিশ্চয়ই তাকে ভালো....

বনহুর নূরীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে–কথা শেষ করো না, আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

সত্যি দেবে?

হাঁ।

তবে বলো আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম?

নূরী, এ কথা আজ নতুন নয়, তুমি আরও অনেকবার এ কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছ।

হাঁ করেছি কিন্তু.....

কি বল?

সঠিক জবাব দাওনি।

আজ দেবো।

আচ্ছা দাও?

তুমি বিশ্বাস করবে তো?

হাঁ করবো।

এসো আমার সঙ্গে।

কোথায়?

পরে বলবো.....

নূরী, বনহুরকে অনুসরণ করলো।

আস্তানার বাইরে নির্জন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় বনহুর। সম্মুখে একটা ফুলের গাছ। সুন্দর সুন্দর কয়েকটা ফুল ফুটে আছে গাছটায়।

সুন্দর! বললো নূরী।

ওর গন্ধ আছে?

আছে! বড় সুন্দর গন্ধ, গাছটা আমিই লাগিয়েছি ও তুমি যখন ঝামদেশে গিয়েছিলো তখন

দাঁড়াও একটা ফুল আমি তুলে আনি।

না না, ও কাজ করো না।

কেন?

জানো, ঐ ফুল আমার অত্যন্ত প্রিয়, আমি ঐ ফুল বড় ভালবাসি......

বনহুর নূরীর মুখে হাতচাপা দিয়ে বলে–চুপ করো।

কেন?

আমি যে জবাব দেবো তা তুমিই নিজে উচ্চারণ করেছো। নূরী, ঐ ফুলগুলোকে তুমি যেমন ভালবাসো, আমি ঠিক তেমনি ভালবাসি আমাকে। ফুলগুলো যেমন নিজ সুগন্ধ ছড়িয়ে তোমাকে মুক্ত করে কিন্তু তুমি ফুলগুলো স্পর্শ করতে চাও না মানে গাছ থেকে ছিঁড়তে চাও না, আমিও ঠিক তাই..... একটু হাসলো বনহুর।

ঐ সময় কায়েস হন্তদন্ত হয়ে এসে দাঁড়ালো, কুর্ণিশ জানালো সে এবং ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বললো–সর্দার!

বল কায়েস। শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো বনহুর।

মিঃ জাফরীকে কান্দাই সরকার বন্দী করেছে।

বলো কি কায়েস।

হাঁ সর্দার।

এ সংবাদ কে তোমাকে জানালো?

শহর থেকে আমাদের অনুচর ইয়াকুব জানিয়েছে এইমাত্র ওয়্যারলেসে এ সংবাদ পাঠিয়েছে তারা।

নূরী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো–মিঃ জাফরী...... তিনি নিজেই তো পুলিশ প্রধান একজন?

হাঁ নূরী।

কিন্তু তাকে বন্দী করেছে কান্দই সরকার, এ কেমন কথা?

তুমি জানো না, এর পিছনে কারণ আছে। এক সময় অবসরমত সব বলবো। কায়েসকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর–মিঃ জাফরীকে যেমন করে তোক উদ্ধার করে আনতেই হবে। কায়েস, যাও তাজকে প্রস্তুত করে নাও।

কায়েস কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করলো।

নূরী বললো–হুর, তুমি কি পাগল হলে?

কেন?

যে পুলিশ অধিনায়ক তোমাকে গ্রেপ্তারের জন্য অহরহ ব্যস্ত থাকতেন, সেই ব্যক্তির জন্য তুমি এত ব্যাকুল হয়ে উঠলে–ব্যাপার কেমন রহস্যময় মনে হচ্ছে।

অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার জন্য অহরহ ব্যস্ত থাকা অপরাধ নয় নূরী, বরং সেটা মহত্বের কাজ। মিঃ জাফরী আমাকে শুধু বন্দী অবস্থায় গ্রেপ্তার করতেই আগ্রহী ছিলেন না, তিনি আমাকে নিহত অবস্থায় পাকড়াও করার জন্যও লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

আর তুমি তাকে উদ্ধারের জন্য এক্ষুণি ছুটলে?

বিলম্ব হলে তাকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তাকে উদ্ধার করা কঠিন হবে।

কিন্তু.....

কিন্তুর জবাব এখন দেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা, মিঃ জাফরীকে উদ্ধার করতে গিয়ে হয়তো আমাকে পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। জানি না কোনো বিপদের সম্মুখীন হবো কিনা। জাভেদ আশার কাছে আছে, তুমি কিছু ভেব না, আমি ফিরে এলেই জাভেদকে নিয়ে আসব।

কি জানি, মন আমার কেমন করছে হুর!

নূরী, কিছু ভেবো না, সঙ্গে আমার খোদার রহমত আছে।

ততক্ষণে কায়েস এবং আরও একজন বনহুরের অনুচর তাজের লাগাম ধরে টেনে আনে।

তাজ প্রভুর পাশে এসে আনন্দে অধীল হয়ে ডান পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে শব্দ করে চিহি চিহি।

বনহুর তাজের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ওর পিঠ আদর করে চাপড়ে দেয়, তারপর কায়েস আর নূরীকে লক্ষ্য করে বলে–তোমরা অহেতুক ভেবো না, আমি মিঃ জাফরীকে মুক্ত করেই ফিরে আসবো।

তাজের পিঠে চেপে বসে বনহুর।

তাজ এবার আনন্দসূচক শব্দ করে সম্মুখের পা দু'খানা উঁচু করে শব্দ করে চিহি চিহি–

এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করে তাজ।

নূরী আর কায়েস স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। নুরী হাত নেড়ে স্বামীকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই নূরী ফিরে চলে আস্তানার অভ্যন্তরে।

কায়েস তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুরের অশ্ব তখন তীরবেগে ছুটে চলেছে। বনজঙ্গল ঝোঁপ–ঝাঁপ আগাছা পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাজ। বনহুর ওর লাগাম ধরে উবু হয়ে বসে আছে। তার মুখভাব কঠিন।

ওদিকে তখন মিঃ জাফরীকে পুলিশ বাহিনী গ্রেপ্তার করে নিয়ে কারাগার অভিমুখে চলেছে।

মিঃ জাফরীর অপরাধ তিনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা থেকে ক্ষান্ত হয়েছেন এবং বনহুরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছেন। চাকরি থেকে যদিও তিনি নিজেই ইস্তফা দিয়েছন তবু দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন সরকারের দৃষ্টিতে।

অবশ্য এ নিয়ে পুলিশ প্রধানদের মধ্যে দ্বিমত পোষণ করেন অনেকে। কারণ এটা মিঃ জাফরীর নিজস্ব ব্যাপার–দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের ইচ্ছা তার অন্তরের। সরকার এ ব্যাপারে মিঃ জাফরীকে এমনভাবে অপদস্থ করবেন অনেকেই ভাবতে পারেননি।

তারপর যখন সত্যই মিঃ জাফরীকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হলো তখন অনেকেই বিস্মিত হলেন কিন্তু মুখে কোনো কথা প্রকাশ করতে পারলেন না। সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলাও মুস্কিল ছিলো।

মিঃ জাফরীর গ্রেপ্তার ব্যাপার নিয়ে শহরে নানাজনের মুখে নানা ধরনের কথার গুঞ্জন উঠলো কিন্তু কেউ প্রকাশ্যে কোনো উক্তি উচ্চারণ করতে পারলো না মিঃ জাফরীকে আটক করায় দেশবাসী খুশি হলো না মোটেই, কারণ দস্যু বনহুর মিঃ জাফরীর জীবন রক্ষা করেছে এবং সে কারণেই বনহুরের প্রতি তার সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব মোটেই দূষণীয় নয়, এটাই সকলের মনে স্থিরতা লাভ করলো।

মিঃ জাফরীকে বন্দী করে কারাগার অভিমুখে নিয়ে চলেছে পুলিশবাহিনী। তার দু'পাশে রয়েছে সশস্ত্র পুলিশ।

হাঙ্গেরী কারাগার অভিমুখে পুলিশ ভ্যানগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। দিনের আলোতে মিঃ জাফরীকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া কেমন যেন দৃষ্টিকটু বলে সন্ধ্যার অন্ধকারে পুলিশ ভ্যানগুলো কারাগারের দিকে এগুচ্ছে।

শহর থেকে বেশ দূরে হাঙ্গেরী কারাগার, কাজেই অনেকটা পথ অতিক্রম করে যেতে হয়। ভ্যানদুটি যখন নির্জন পথ অতিক্রম করে এগুচ্ছিলো, ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা গুলী এসে বিদ্ধ হলো সম্মুখ ভ্যানের চাকায়।

সঙ্গে সঙ্গে চাকা ফেঁসে গেলো।

ভ্যান দুটি থেমে পড়লো অকস্মাৎ।

অমনি বনহুর অশ্ব নিয়ে আক্রমণ করলো ভ্যান দুটিকে।

পুলিশ বাহিনী গুলী ছুঁড়বার পূর্বেই বনহুর ভ্যানের উপর লাফিয়ে পড়লো।

পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো এদিক ওদিক। তারা অবিরাম বনহুকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। বনহুর কৌশলে গুলীর কবল থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে এক একজনকে মুষ্টাঘাতে ধরাশায়ী করে চললো। খুব দ্রুত সে পুলিশ বাহিনীকে কাবু করে ফেললো।

অবশ্য শেষে গুলী চালাতে হলো বনহুরকে, যারজন্য নিহত হলো কয়েকটা পুলিশ।

এবার পুলিশ বাহিনী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো, পালালো যে যেদিকে পারলো সেইদিকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ জাফরীকে ধরে নামিয়ে নিলো ভ্যান থেকে নিচে। তাকে এবার তুলে নিলো তাজের পিঠে, তারপর উঠে বসলো সে নিজে।

মুহূর্তে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো বনহুর মিঃ জাফরীসহ।

পুলিশ ভ্যান দুটি পড়ে রইলো।

বেশ কিছুক্ষণ পর নিহত পুলিশের লাশগুলো নিয়ে ফিরে চললো ভ্যান দুটি।

*

বনহুর, কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাবো ভেবে পাচ্ছি না। তুমি আমার পরম বন্ধু! মিঃ জাফরী কথাগুলো বলে থামলেন।

বনহুর রুমালে মুখের ঘাম মুছে রুমালখানা পকেটে রাখতে রাখতে বললো–ও সব ধন্যবাদ না জানালেও চলবে তবে সবসময় আমাকে পরম বন্ধু মনে করলে খুশি হবো।

সত্যি তুমি সাধারণ মানুষ নও বনহুর।

সবাই আমাকে তাই বলেই জানে কিন্তু আসলে আমি সাধারণ মানুষই বটে, কারণ অন্যান্য সবার মতই আমার শরীরে রক্তমাংস আছে, আমার হৃদয় বা মন আছে। তবে কেন আমাকে আপনারা অসাধারণ মানে একটা অদ্ভুত জীবন মনে করে দূরে সরিয়ে রাখতে চান?

বনহুর, তুমি ঠিক বুঝতে পারছে না। একটু থেমে বললেন মিঃ জাফরী–একদিন তোমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমি উন্মাদ হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু আজ বুঝতে পারছি....

থাক, ও কথা আপনি পূর্বেও বলেছেন।

কিন্তু বারবার আমার মনের নাড়া দিচ্ছে তোমাকে না চিনতে পেরে আমি কত অপরাধ করেছি। তোমাকে কতবার গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটক করেছি...

এ জন্য দুঃখিত বা লজ্জিত হবার কিছু নেই, কারণ আপনার কর্তব্য আপনি করেছেন বা করেছিলেন। আপনি কর্তব্যচ্যুত হননি এ জন্য আমি নিজেও আপনার কথা ভেবে আনন্দবোধ করতাম। সত্য এবং নিষ্ঠা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, করেছে কর্তব্যপরায়ণ, এটা আমার শুধু নয় দেশবাসীর জন্য গৌরবের কথা ছিলো একটু থেমে বললো–মিঃ জাফরী, আমি আপনার যত উপকার করি না কেন আসলে আমি অপরাধী।

না, তুমি অপরাধী নও। তুমি যা করা বা করেছে তা অন্যায় নয়। দেশের জনগণ তোমাকে ভালোবাসে, কারণ তুমি যা করো, জনগণের মঙ্গলের জন্যই করো। জানো, আজকাল দেশের কিছু সংখ্যক লোক দেশের সর্বনাশ করে চলেছে.... তারা শুধু দস্যু নয়, তারা নরশয়তান।

আমি জানি মিঃ জাফরী কিন্তু আর বেশি দূর নয়, এদের মসনদের চূড়া ধসে পড়বে অচিরেই। দাঁতে। দাঁত পিষে বললো বনহুর। তারপর মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললো–আপনি বিনাদ্বিধায় বিশ্রাম করুন।

কিন্তু.....।

যা করতে হয় আমি করবো।

এ কোথায় আমাকে নিয়ে এসেছে বনহুর?

এটা এমন এক জায়গা যেখানে কেউ আপনার সন্ধান পাবে না। আপনি এখানে সব পাবেন, সংবাদপত্র এমনকি টেলিভিশন পর্যন্ত। কোনো চিন্তার কারণ নেই।

বনহুর বেরিয়ে গেলো কথাগুলো বলে।

মিঃ জাফরী তাকিয়ে দেখলেন পাশে এক প্যাকেট মূল্যবান সিগারেট এবং একটা লাইটার। তিনি তুলে নিলেন হাতে সিগারেট প্যাকেটটা ও লাইটারটা।

আপনমনে সিগারেট পান করে চলেছেন মিঃ জাফরী। এমন সময় দু'জন লোক কিছু খাবার রেখে গেলো তার সম্মুখে। শুধু খাবার নয়, কিছু পানীয়ও ছিলো তার মধ্যে।

মিঃ জাফরী ক্ষুধার্ত ছিলেন, তৃপ্তি সহকারে খেলেন।

বনহুর যখন মিঃ জাফরীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো তখন রাত্রির অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠেছে।

তাজের পিটে চেপে বসলো বনহুর।

কান্দাই শহরের তখন নিদ্রার আমেজ নেমে এসেছে।

তাজের খুরের শব্দে পাথুরিয়া পথ প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। অনেকের বুক কেঁপে উঠলো সে শব্দে, আবার অনেকের মুখ খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড রাগেক্ষোভে নিদ্রাহীনভাবে পায়চারী করছিলো। চোখে তার ঘুম আসছিলো না, কারণ মিঃ জাফরীকে তিনি কারাগারে পাঠিয়ে একটা শান্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু কয়েক ঘন্টার মধ্যেই যখন জানতে পারলেন দস্যু বনহুর মিঃ জাফরীকে উদ্ধার করে নিয়েছে এবং কয়েকজন পুলিশকে নিহত করেছে তখন মিঃ হানিংস বার্ড যেন বস্ত্রের মত ফেটে পড়লেন। তখনই তিনি অপর তিনটি পুলিশ ভ্যান সহ উক্ত স্থানে হাজির হয়ে সবকিছু স্বচক্ষে দর্শন করলেন।

অবস্থা দেখে চক্ষু তার স্থির হলো।

শুধু দস্যু বনহুরের প্রতি তার রাগ হলো না, রাগ হলো মিঃ জাফরীর উপরও। একজন দক্ষ পুলিশ সুপার যিনি একদিন পুলিশ ইন্সপেক্টার ছিলেন এবং দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করার পর তিনি প্রমোশন লাভ করে চাকরিতে সম্মান পেয়েছিলেন, আজ সেই অভিজ্ঞ পুলিশ অধিনায়ক দস্যু স্বপক্ষে গেলেন কি করে? করলেই বা প্রাণ রক্ষা, তাই বলে দস্যুকে জানাবেন সহানুভূতি।

মিঃ হার্নিংসো বার্ড ক্রুদ্ধ সিংহের মত ফোঁস ফোঁস করছিলেন। মিঃ জাফরীকে বন্দী করতে না পেরে তার রাগ চরমে উঠেছিলো যেন।

পায়চারী করে বলেছেন হার্নিংসো বার্ড।

মিসেস হার্নিংসো বার্ড শুয়ে শুয়ে স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। নরম তুলতুলে বিছানাটাও ভাল লাগছে না তার। কামরার নীলাভো আলো তার মনে

রঙিন স্বপ্নে মেহজাল বিস্তার করছিলো কিন্তু সে মোহময় মুহূর্ত নীরস লাগছিলো মিসেস হার্নিংসো বার্ডের কাছে। কিছুক্ষণ পূর্বে মেজো মেয়ে পলি পিয়ানো বাজাচ্ছিলো পাশের কক্ষে। পিয়ানো বাজনা শেষ করে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে পলি কিন্তু তার পিয়ানোর সুমিষ্ট সুরের রেশ তার কানে প্রতিধ্বনি জাগাচ্ছিলো।

এক সম্পদ আজ তাদের তবু কেন স্বামীর মনে স্বস্তি নেই। ভেবে পান না মিসেস হার্নিংসো বার্ড।

স্লিপিং গাউন পরে শয্যা ত্যাগ করে পাশের কক্ষে গেলেন মিসেস হার্নিংসো। স্বামীকে চিন্তিতভাবে কক্ষে পায়চারী করতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন–কি হয়েছে তোমার বলো তো?

মিঃ হার্নিংসো বার্ড বললেন–ও তুমি বুঝবে না।

তুমি যা না বোঝো তা আমি বুঝি। আজ বাড়িতে যে উপঢৌকন আসছে আর এসেছে, এ সব কার সৌজন্যে বলো তো?

তা তো জানি কিন্তু.....

কিন্তু কি?

একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে..

দুর্ঘটনা!

হাঁ। মিঃ জাফরীকে কারাগারের পাঠানো হয়েছিলো কিন্তু পথের মধ্যে তাকে দস্যু বনহুর উদ্ধার করে নিয়ে ভেগেছে।

তাতে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

জানো না, মিঃ জাফরী আমার মুখের উপর যা বলেছিলো, আমি তাকে সায়েস্তা না করে ছাড়বো ভাবছো!

তাকে নাকি দস্যু বনহুর উদ্ধার করে নিয়ে গেছে?

হাঁ।

তবে কি করে তাকে সায়েস্তা করবে তুমি?

সেই চিন্তাই করছিলাম।

সমস্ত আরাম–আয়েশ বিসর্জন দিয়ে ঐ চিন্তাই করবে তুমি? এসো, শোবে এসো

তুমি যাও, আমি আসছি।

চলোনা, আমার চোখে ঘুম আসছে না। আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।

আজ এত আনন্দ হচ্ছে কেন তোমার?

জানো মিঃ হারুন আজ এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটা হীরার আংটি বড় খোকাকে দিয়েছেন–সত্যি বড় অপূর্ব আংটিটা।

আমি শুনেছি এবং খোকার আংগুলে দেখেছি।

তবু তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

তা আবার হয় না কিন্তু জানো মিঃ হারুন কেন দিলেন ঐ হীরার আংটি?

কেন, হয়তো খোকাকে ভালবাসেন কিংবা খোকাকে তাদের পছন্দ হয়েছে। তুমি জানো না, মিঃ হারুনের এক মেয়ে আছে–বড় সুন্দরী!

তা জানি না, তবে মিঃ হারুন আমার কাছে কোটি কোটি টাকা মূল্যের উপকারের উপকৃত হয়েছেন।

সে কি রকম?

তা জানতে চেও না, কারণ দেয়ালেরও কান আছে।

দেয়ালের কান আছে, বলো কি?

হাঁ, আজকাল দেশের লোকজন সবাই যেন কেমন হয়ে গেছে।

তার মানে! ওগো তুমি না বলো দেশের জনগণ সবাই তোমাকে ভালবাসে!

হাঁ, জনগণ আমার আর আমিও তাদের। আমি জনগণকে ভালবাসি, জনগণ আমাকে ভালবাসে। কিন্তু কিছু জনগণ যারা দুঃস্থ নামধারী মানে সর্বহারা তারা একটু কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের।

তুমি তাদের সায়েস্তা করতে পারোনা?

আমি হলাম কিনা ওদের ত্রাণকর্তা আর আমি করবো তাদের সায়েস্তা। ছিঃ ছিঃ এমন কথা ভাবতে পারলে?

আমি কিছু ভাবতে চাই না। দিন দিন তুমি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছ। এত অর্থ আমাদের আছে যা দিয়ে কান্দাই শহরের অর্ধেক আমরা কিনে নিতে পারি। বিদেশে বাড়ি করতে বললাম এত করে, তা করলে না।

বাড়ি–গাড়ি এ সব তো নগণ্য জিনিস, যা টাকা আমাদের আছে তা দিয়ে বিদেশে কয়েকটা বাড়ি হবে, গাড়ি হবে–যা চাও তাই পাবে তখন। জানো পলির মা, আমাদের খোকাদের কোনো দিন ভাবতে হবে না, যুগ যুগ ধরে কেটে যাবে তাদের আমাদের সঞ্চিত অর্থে। শুধু কি তাই, যে সম্মান আমি পেয়েছি তা কোনো দেশের নেতার ভাগ্যে হয় না। জানো পলির মা, আরও একটা কাজ আমি করেছি–যারা এখন কান্দাইয়ের হর্তাকর্তা হবেন তারা সবাই আমার দলের লোক থাকবেন। বাইরের মানে অন্য কোনো দলের লোক আর যেন কোনো রকম আধিপত্য স্থাপন করতে না পারে সেদিকে আমি কড়া নির্দেশ দিয়েছি।

তোমার দেশ নিয়ে আলোচনা শুনতে আমি আসিনি! কাল বড় খোকার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে লোক আসবে, তাদের সঙ্গে কিভাবে আলাপ আলোচনা হবে, এ নিয়ে অনেক কথা ছিলো তোমার সঙ্গে।

বড় খোকার বিয়ের লোক আসবে তাতে আর কথার কি আছে? বিয়ে হবে, মেয়ে যখন খোকার পছন্দ করাই আছে....

তবু কথা নাই..... বলো কি?

শোনো পলির মা, ওরা আপন ইচ্ছায় যা দেন তাই শ্রেয়, কারণ খোকা নিজে এতদিন যা উপার্জন করেছে তাই ওর যথেষ্ট ভবিষ্যতে নিজে একজন ধনকুবেরু নামে খ্যাতি অর্জন করবে দেখে নিও।

ওর যতই থাক তাই বলে বিনা যৌতুকে কন্যাদান করবেন মেয়ের বাবা তা হয় না।

বললাম তো যা ওরা দেবেন না চাইলেও দেবেন, বুঝলে? শোনো পলির মা, তোমার ছেলের বিয়েতে যে সব মহান অধিপতিরা আমন্ত্রিত হয়ে আসবেন তারা সবাই আমার কাছে ঋণী। মানে উপকৃত, বুঝলে? তারা কেউ খালি হাতে আসবেন না।

তা জানি শুনলাম রাব্বী সাহেব একটা প্রেসিডেন্ট গাড়ির জন্য লণ্ডনে তার ছেলের কাছে লিখেছেন খোকার বিয়েতে উপহার দেবেন।

শুধু রাব্বী সাহেব নয় পলির মা, অমন গাড়ি কত নেবে? একটা আনন্দের এবং তৃপ্তির হাসি হাসলো মিঃ হার্নিংসো বার্ড।

সত্যি, আমাদের কত ভাগ্য! ওগো শুনছো, সংবাদপত্রগুলো এত নীরস কেন?

কি হয়েছে তাই বলো?

ঐ সব কঙ্কালসার মানুষগুলো ফটো ছাপে কেন? ওরা তো সমাজের কলঙ্ক..

শুধু কলঙ্ক নয় পলির মা, ওরা দেশের অভিশাপ। শুধু পথে পথে আবর্জনার মত ঘুরে বেড়াবে আর দেশের শান্তি নষ্ট করবে।

তা ওদের ছবি ছেপে সংবাপত্রের কি লাভ হয় বলো?

এ কারণেই আমি নির্দেশ দিয়েছি সংবাদপত্রগুলো বন্ধ করে দিতে। ওরা বড় বেয়াড়া হয়ে গেছে। ঐ অপদার্থ দুঃস্থ নামধারী মানুষগুলোর হাড় জিরজিরে ছবিগুলো তুলে ধরবে লোকচক্ষুর সম্মুখে।

সত্য বলছো ঐ সব ছবিগুলো দেখলে আমার ঘেন্না হয়। জানো আজকাল পথে বের হলেও শুধু ঐ মানুষগুলোই চোখে পড়ে। গাড়ি থামলেই গাড়ির পাশে

এসে ঘেন্ ঘে–করে কি যে বিশ্রি লাগে আমার তোমাকে কি বলবো!

এ কথা তুমি ঠিকই বলেছো পলির মা, যদিও আমার গাড়ির সামনে আবর্জনাগুলো এসে ভিড় জমাতে পারে না কিন্তু যখন ঐ সংবাদপত্রের পাতায় দেখি তখন মনটা কেমন বিষিয়ে উঠে। তাছাড়া সভা সমিতিতে যখন গিয়ে দাঁড়াই তখন আশেপাশে ছাড়া দূরে দৃষ্টি চলে গেলেই সব কথা ভুলে যাই। ঐ সব উলঙ্গ অর্ধউলঙ্গ লোকগুলোর চেহারা আমার দম বন্ধ করে দেয়। সবাই শুধু হা হা আর খা খা করছে। অভাব আর অভাব–মোটেই এসব ভাল লাগে না।

তুমি যাই বল, দেশটা এদের জ্বালায় রসাতলে গেলো। লোকে কি বলে জানো?

কি বলে?

বলে বিদেশ থেকে প্রচুর সাহায্য দ্রব্য আসে তা সব কোথায় যায়? পথেঘাটে এতে লোক না খেয়ে মরে কেন?

সব ঐ সংবাদপত্র, বুঝলে?

তার মানে?

মানে সংবাদপত্রগুলোই তো ছড়ায় কত বিদেশী সাহায্য এলো। নাহলে জনগণ এত জানবে কি করে।

তুমি সংবাদপত্রগুলোই বন্ধ করে দিয়ে ভালই করছে।

হু! তবু তো কিছু কিছু পত্রিকা প্রকাশ পাচ্ছে, অবশ্য তা গোপনে। এই পত্রিকাগুলো সব গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়, বুঝলে পলির মা? একটু থেমে বললেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড–যা বিদেশী সাহায্য আসে। তা আমার হিতাকাফীজনদের আত্নীয় স্বজনদের মধ্যেই সংকুলান হয় না। চাচা পহেলা আপন জান। বাঁচা...... কথাটা বলে হাসেন মহামান্য নেতা।

রাত বাড়াতে থাকে।

মিসেস হার্নিংসো বার্ড বললেন–মিঃ জাফরীকে সরাতে চেয়েছিলো কারণ সে অন্যায় বরদাস্ত করতে পারে না!

তুমিও ঐ কথা বলছো পলির মা? যারা অপদার্থ তারাই ও কথা বলবে। মিঃ জাফরী শুধু নয়, আরও কিছু অফিসার আমার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে আমি সব জানি। আর জানি বলেই তাদের সবাইকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছি। এদের প্রশ্রয় দেওয়া মোটেই উচিত হবে না তাই।

পলির মার চোখ দুটো তখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে, তাই বার বার তিনি হাই তুলছিলেন, তবু বললেন–তোমাকে তো রাত ছাড়া দিনে পাওয়াই যায় না, সব সময় তোমার গুণ গ্রাহীরা তোমাকে ঘিরে থাকে, কথা বলবো তারও সময় হয় না।

কেন, রাতে তো সব সময় তোমার পাশেই আছি। বলো তোমার কি বলার আছে?

ঐ যে যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা কি সবাই ছাড়া পেয়েছে। মিঃ হারুন সাহেবের ছেলে....

শুধু হারুন সাহেবের ছেলেই নয়, যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদের মধ্যে আছে আমার অনেক হিতৈষী বন্ধু, যারা সব সময় আমার মঙ্গল চায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন মিঃ হার্নিংসো বার্ড–আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আমি এদের সবাইকে মুক্তি দেবো। এখন নিশ্চিন্ত হলে তো? যাও ঘুমাবে যাও।

তুমি!

চলো আমিও যাচ্ছি।

*

মিঃ জাফরীকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে হুর?

হাঁ নূরী।

তাই তোমাকে আজ বড় শান্ত লাগছে।

ঠিক তাই। মিঃ জাফরীর বয়স হয়েছে, এ অবস্থায় তিনি কারাগারে বন্দী হলে বাঁচতেন না। তাছাড়া লোকটা বড় মহৎ তাই আমি তাকে উদ্ধার করে এনেছি।

কোথায় আছেন তিনি?

আমার শহুরের আস্তানার গোপন এক কুঠরির মধ্যে।

তাকে কতদিন এমনভাবে লুকিয়ে রাখবে শুনি?

যতদিন না তার মুক্তিপত্র আদায় করে আনতে পারবো।

মুক্তিপত্র?

হাঁ, কান্দাই অধিপতির স্বাক্ষরসহ মুক্তিপত্র লাগবে, তা হলেই মিঃ জাফরীর সমস্ত বিপদ দূর হবে। তিনি সচ্ছন্দে কাল যাপন করতে পারবেন।

কিন্তু কান্দাই অধিপতির স্বাক্ষরসহ মুক্তিপত্র তুমি কোথা পাবে বনহুর।

ও চিন্তা করো না নূরী কান্দাই অধিপতির স্বাক্ষর পেতে বিলম্ব হবে না। তবে কিছুদিন বিলম্ব করতে হবে এ ব্যাপারে কান্দাইয়ে আবার শুরু হয়েছে সঠিক সংবাদ নিয়ে এলেই আমি কাজ শুরু করব। নূরী, আমাকে একবার আশার ওখানে যেতে হবে, কারণ জাভেদকে না আনলে সে হয়তো একই রওনা দেবে।

ঠিক বলেছো, হুর, জাভেদ সেখানে কি করছে কেমন আছে যদি সে একাই আস্তানা অভিমুখে রওনা দেয় তাহলে পথে সে হারিয়ে যেতে পারে কিংবা কোনো বিপদে পড়তে পারে। তুমি আজই যাও, ওকে। নিয়ে এসো।

তুমি না বললেও আমি যাবো মনস্থির করেছি।

সত্যি, জাভেদের জন্য মনটা আমার বড় উতলা হয়ে উঠেছে।

নূর, ফুল্লরা কোথায়?

ও, এবার তুমি তাকে দেখতেই পাওনি! নূরী বেরিয়ে যায়।

একটু পরে ফিরে আসে নূরী, তার সঙ্গে ফুল্লরা। মাথায় ওর ঝাকড়া চুল। ফুলের মত, ফুটফুটে সুন্দর মুখা। টানা টানা দুটি চোখ। নুরী বললো–এই নাও তোমার ফুল্লরা।

বনহুর খুশিতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, টেনে নিলো সে কোলের কাছে, আদর করে ডাকলো–ফুল্লরা, তুমি তো অনেক বড় হয়ে গেছো? বলো কি নিবে আমার কাছে

ফুল্লরা বললো–তুমি আমাদের সর্দার, তাই না? ..

হেসে বললো বনহুর, কে বললো আমি তোমাদের সর্দার।

কেন আমি বলে তারপর নূরী মামনি বলে। আরও সবাই বলে তুমি সর্দার।

যদি মনে করো তবে তাই। কিন্তু বললে না তো কি নেবে আমার কাছে।

যা চাইবো দেবে আমাকে

নিশ্চয়ই দেবো। বল কি নেবে?

তোমার ঐ পিস্তলটা। ফুল্লরা বনহুরের কোমরের পিস্তলখানা দেখিয়ে দিলো ফুল্লরা।

বনহুর হেসে বললো–পিস্তল নিয়ে কি করবে?

যারা বদমাইশ তাদের মারবো, যেমন তুমি মারো।

ফুল্লরা! বনহুর তাকালো।

এবার নূরীর মুখের দিকে।

নূরী বললো–তোমার স্বভাবই পেয়েছে ফুল্লরা। শুনেছি ছোটবেলায় তুমি নাকি এমনি ছিলে।

বনহুর বললো–ফুল্লরা পিস্তল সখের জিনিস নয়, তুমি যা চাইবে তাই পাবে। বলো কি চাও তুমি?

তুমি যা দেবে আমি তাই নেবো। আচ্ছা সর্দার?

বলো?

আমাকে একটা মনিহার দেবে?

মনিহার।

হাঁ! আমার আম্মি বলেছে মনিহার নাকি সাত রাজার ধন।

ঠিক বলেছেন তোমার আমি। আচ্ছা, আমি তোমাকে মনিহার এনে দেব।

সত্যি দেবে তো?

দেবো।

বনহুর নূরীর চিবুকটা তুলে ধরে বলে– ঠিক তুমিও একদিন অমনি ছিলা কত দুষ্টোমি করতে তুমি?

তোমার মনে আছে সব কথা?

সব মনে আছে!

চলোনা দীঘির পানিতে আজ সাঁতার কাটি।

যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে চল।

বনহুরের আস্তানার মধ্যে এ দীঘি। চারিদিকে সুউচ্চ পাষাণ প্রাচীর। কারো সাধ্য নেই এ দীঘির পানি স্পর্শ করে। শুধু এখানে সাঁতার কাটতে বনহুর নিজে তারপর সঙ্গীহলো একদিন নূর।

বনহুর আর নূরী যখন দীঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালো তখন বেলা শেষ হয়ে এসেছে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো–নূরী দীঘির ওপারে যে আগে পৌঁছবে সে জিতবে।

কিন্তু কি পুরস্কার পাবে সে?

যা চাইবে তাই পাবে। বললো নূরী।

আর তুমি যদি জিতে যাও তাহলে কি নেবে?

দুদিন তোমাকে কোথাও যেতে দেবো না অর্থাৎ আস্তানার বাইরে বেরুতে দেব না।

সর্বনাশ, তাহলে আটকাতে চাও?

হাঁ।

তবে যেমন করে হয় জিততেই হবে আমাকে..... বনহুর কথাটা বলে ড্রেস পালটানোর কক্ষে প্রবেশ করলো।

নূরীও প্রবেশ করলো দ্বিতীয় ড্রেসিংরুমে।

যখন বনহুর আর নূরী বেরিয়ে এলো তখন উভয়ের দেহেই সাঁতারু ড্রেস।

বনহুর বললো–ওয়ান– টু থ্রি–সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে দীঘির পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

দু'জনে সাঁতার কাটতে লাগলো!

দীঘির নীল পানিতে প্রতিযোগিতা শুরু হলো বনহুর আর নূরী মিলে।

হঠাৎ মাঝামাঝি যখন এসেছে, তখন পানিতে ভীষণ একটা আলোড়ন শুরু হলো। কিসের এ আলোড়ন বোঝা গেলো না।

একটু পর আলোড়ন স্থির হয়ে গেলো কিন্তু একি, বনহুর কোথায়। নুরী প্রথমে মনে করলো বনহুর নিশ্চয়ই ডুবসাঁতার দিয়ে এগিয়ে গেছে সম্মুখে।

নূরী সাঁতার কেটে এগুতে লাগলো।

দীঘির পরিধি কম নয়, প্রায় অর্ধমাইল হবে।

নূরী ওপারে পৌঁছে হতবাক হলো, বনহুরকে সে দেখতে পেলো না। বুকটা কেমন ধক্ করে উঠলো তার।

সঙ্গে সঙ্গে নূরী চললো ড্রেসিং রুমে, সঁতারের পোশাক পরিবর্তন করে নিয়ে ছুটলো বনহুরের অনুচরদের কাছে। সমস্ত কথা সে বললো কায়েস ও

অনুচরদের–কোথায় গেলো সে।

অনুচরদের মুখ কালো হয়ে পড়লে তারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলো বনহুরের পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা দীঘির পাড়ে। দীঘির নীল পানিতে অনেক করে খোঁজ হলো কিন্তু কি অবাক কাণ্ড বনহুর গেলো কোথায়?

নূরীর চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এলো, সে নিজের ঘরে গিয়ে ভীষণ কান্নাকাটি জুড়ে দিলো।

নাসরিন ছুটে এলো, সে অনেক করে বোঝাতে লাগলো কিন্তু কিছু বোঝে না। সে বারবার নিজের মাথার চুল টেনে ছিঁড়তে লাগলো, কেন সে তাকে সাঁতারে উদ্বুদ্ধ করেছিলো, এ কথাই বলতে লাগলো সে বার বার।

সমস্ত আস্তানায় বিপদ সংকেতধ্বনি করা হলো।

বনহুরের অনুচরগণ কে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। দীঘির পানি অথৈ, কাজেই দীঘির পানির তলায় কোথায় কি হয়ে গেলো সর্দার, তারা ভেবে পাচ্ছে না।

সংবাদ শুনে বৃদ্ধ দাইমা নিজের গুহা থেকে বেরিয়ে এলো এ দীঘি যখন খনন করা হয়েছিলো তখন বৃদ্ধ দাইমার বাবা জীবিত ছিলো। সে ঐ দীঘি খননে সহায়তা করেছিলো কান্দাই মহারাজকে।

বৃদ্ধ তখন শিশু হলেও একেবারে কচি ছিলোনা, সে দীঘির গোপন কথা জানতো।

বৃদ্ধা বললো–তোমরা ঘাবড়ে যেও না। সর্দার মরেনি, সে ঠিক বেঁচে আছে।

সবাই অবাক হলো।

নূরী আঁচলে চোখ মুছে এলো তার পাশে; ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে বললো–দাইমা, তুমি বলো সত্যি সে বেঁচে আছে তো? ঐ গভীর পানির তলদেশে কি করে বেঁচে থাকবে সে।

বৃদ্ধা বললো–অনেক দিন থেকে ভাবছি কথাটা সর্দারের কাছে বলবো কিন্তু বলা আর হয়নি।

বলো, বলো দাইমা, দেরী আমার সইছে না?

বলছি শোন্ তবে।

বলো

নূরীর সঙ্গে অন্য সকলে ঘিরে ধরলো দাইমাকে।

বৃদ্ধা দাইমা বলতে শুরু করলো–আজ এখানে বিরাট জঙ্গল কিন্তু একদিন এখানে ছিলো সুন্দর একটা নগর। নগরের এক প্রান্তে ছিলো রাজা জ্যোতিষ্কের রাজপ্রাসাদ। আজ যেটা পোড়োবাড়ি, রূপ ধারণ করেছে। একটু থামলো বৃদ্ধা, হয়তো সেদিনের সেই রাজপ্রাসাদ তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠলো।

আবার বলতে শুরু করলো বৃদ্ধা দাইমা–রাজা জ্যোতিষ্ক ছিলেন নিঃসন্তান। ছেলেমেয়ে না থাকায় মহারাজের মনে শান্তি ছিলো না। শুধু তাই নয় মহারাণী অবিরত শুধু ভাবতেন, কেন তাদের ছেলেমেয়ে হলো না। কি করে তাদের বংশ রক্ষা পাবে, এমনি কত কি! রাণী যখনই শুনতেন কোথাও কোনো সন্নাসী বা দরবেশের আবির্ভাব হয়েছে তখন সেখানেই তিনি ছুটতেন। মহারাণীর নিজস্ব একটা রথ ছিলো ঐ রথে চেপে তিনি এখানে সেখানে যেতেন।

আমার বাবা ছিলেন সেই রথের সারথী।

বাবা ছাড়া কেউ সে রথ চালাতে পারতো না।

রথে থাকতে সাতটা ঘোড়া।

নূরী অবাক হয়ে শুনছে।

অন্য সবাই হতবাক, পুরোন দিনের কথা এ সব যেন স্বপ্ন বা কল্পনার বলে মনে হচ্ছে।

বৃদ্ধা বললো–চার ঘোড়ার রথ হয়। আবার ছয় ঘোড়ার হয় মানে রথ চলে। বারো ঘোড়ায় চলে কিন্তু বেজোড় ঘোড়ায় কোন দিন কি রথ চলে?

তাই তো, এ যেন অদ্ভুত কথা। রথ সব সময় জোড়া ঘোড়ায় চলে কিন্তু বেজোড় ঘোড়ায় কি করে চলবে বা চলতে পারে? বলল কায়েস।

বৃদ্ধা বললো–তাও চলে। আর সেই কারণেই আমার বাবার প্রয়োজন ছিলো। বাবা ছাড়া সাত ঘোড়ার রথ কেউ চালাতে পারতো না। রথখানা আমি দেখেছি–থের সর্বপ্রধান থাকতো একটা ঘোড়া, তারপর থাকতো জোড়া জোড়া ঘোড়া তাই রথ স্বাভাবিকভাবেই চলতো।

একদিন শোনা গেলো নগরের দক্ষিণে এক বটবৃক্ষ তলায় এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছে। তার মাথায় যে জটা আছে তার মধ্যে নাকি জীবন্ত সাপ বাস করে। সন্ন্যাসীর কথায় যা না ঘটতে পারে। তিনি সব কথা বলে দিতে পারেন, এমনকি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি বলতে পারেন। রাণী তার কথা শোনা মাত্র আমার বাবাকে রথে ঘোড়া লাগাতে চললেন।

বাবা রথে অশ্ব–সংযোজন করে ফেললো।

সন্ন্যাসীর নিকটে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে সন্নাসী মহারাণীর মনের কথা ব্যক্ত করলেন, বললো–তুমি যে কারণে এসেছো আমি তা জানি। কোনো দিনই তোমার মনের বাসনা পূর্ণ হবে না।

মহারাণী সন্ন্যাসীর পায়ে নতজানু হয়ে করজোরে বললেন–আপনি দয়া করলে আমার এই নিঃসন্তান জীবনে সন্তান দান করতে পারেন। হে সন্ন্যাসী বাবা, আমাকে বিফল মনে ফিরিয়ে দিবেন না।

মহারাণীর কথায় সন্নাসী বাবাজী মাটিতে কয়েকটা আঁচড় কেটে বললেন, একটা সন্তান লাভ করা সম্ভব হবে যদি এক কঠোর তপস্যায় উত্তীর্ণ হতে পারে।

মহারাণী, সন্তান আশায় এমন উতলা হয়ে উঠেছিলেন যার জন্য তিনি কোনো কাজ ছিলো না যা মহারাণী করতে পারবেন।

সন্ন্যাসীকে বললেন মহারাণী, বলুন কিসের তপস্যা?

সন্ন্যাসী বললেন–রাজপ্রাসাদের উঠানে একটা দীঘি খনন করতে হবে, যে দীঘির পরিধি হবে অর্ধ মাইল। প্রতিদিন সেই দীঘিতে গভীর রাতে স্নান করতে হবে আপনাকে, তারপর একদিন দেখবেন আপনার গর্ভে এক সন্তান আগমন

করেছে। সেই সন্তান হবে এক বিশ্বজয়ী বীর কিন্তু মনে রাখবেন দীঘিতে প্রতিদিন স্নান করতে হবে যদি স্নান বন্ধ করেন তাহলেই সব ব্যর্থ হবে।

এরপর মহারাণী আর বিলম্ব করেন নি তিনি রাজ প্রাসাদে ফিরে এসে রাজাকে সন্ন্যাসীর বুলী বর্ণনা করে শোনালেন এবং দ্রুত একটা দীঘি খনন করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

মহারাজ রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। মহারাণীর কথা তিনি ফেলতে পারলেন না। এক বছরের মধ্যেই তিনি রাজপ্রাসাদের উদ্যানে অধমাইল ব্যাপী এক দীঘি খনন করে নিলেন।

দীঘি খনন কাজ যেদিন শুরু হয়েছিলো সেইদিন সন্ন্যাসী বাবাজী নিরুদ্দেশ হলেন। সবাই মনে করলেন নিশ্চয়ই কোনো দেবতা বা ফেরেস্তা হবে, রাণীকে উপদেশ দিয়ে তিনি হাওয়ায় মিশে গেছেন।

সবাই সন্ন্যাসীর আসনতলে গড়াগড়ি দিতে লাগলো। সন্ন্যাসী বাবার চরণধুলি মাথায় মাখতে লাগলো নগরবাসীরা। সন্ন্যাসী নেই সন্ন্যাসী বাবার চরণধুলি আছে তো সেখানে।

ওদিকে চললো দীঘির খননকাজ।

দেশ–বিদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে দীঘি খনন কাজ করতে লাগলো।

রাণীর মনে আনন্দ ধরে না। দীঘি খনন কাজ শেষ হলে পানি উঠবে, দীঘিতে তারপর প্রতি রাতে স্নান করবেন তিনি সেই দীঘিতে। তারপর তার গর্ভে আসবে ফুলের মত সন্দুর ফুটফুটে এক সন্তান। যে জন্ম নেবার পর রাজ্যময় আনন্দ উৎসব হবে। লাখো লাখো দীনদুঃখীকে দান করবেন রাণী নিজ হাতে। কাঙ্গালী ভোজন করবেন, আরও কত কি, তিনি মনে মনে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন।

একদিন দীঘির কাজ শেষ হলো।

দীঘি ভরে উঠলো অথৈ পানিতে।

রাজা এবং রাণীর আনন্দ ধরে না। রাণী দীঘির জলে পদ্মফুলের বীজ ছড়িয়ে দিলেন। কয়েক মাসের মধ্যেই পদ্মফুলে ভরে উঠলো দীঘির বুক। রোজ গভীর

রাতে দীঘির পানিতে স্নান করে।

ভিজা চুলে ভিজা কাপড়ে রাণীর যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করেন তখন মহারাজ তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে অন্তপুরে নিয়ে যায়।

এমনি করে কেটে চলে দীর্ঘ একটা বছর।

শেষ তারিখ পড়লো অমাবস্যা রাত।

ঐ রাত দীঘিতে স্নান করা রাণীর শেষ রাত।

রাণী সহচরীদের সঙ্গে দীঘিতে গেলেন স্নান করতে।

কিন্তু ঐ যে ডুব দিলেন আর দীঘির পানি থেকে উপরে উঠে এলো না।

রাজা প্রতীক্ষা করছেন বুকভরা আশা নিয়ে।

আজ দীঘিতে স্নান করার একবছর পূর্ণ হবে। রাণী সন্তান লাভ করবেন। সে সন্তান হবে বিশ্বময়ী বীর। রাজার চোখে আনন্দ উচ্ছ্বাস, দীপ্ত তার মুখমণ্ডল।

মহারাজ পায়চারী করে চলেছেন।

এমন সময় রানীর সহচারীরা ফিরে এলো, তাদের মুখ বিষণ্ণ মলিন। চোখ ছলছল করছে।

মহারাজ বলে উঠলো–তোমাদের দেখছি কিন্তু রাণী কোথায়?

একজন পরিচারিকা কেঁদে উঠে বললো–মহারাণী দীঘিতে ডুব দিয়েছেন কিন্তু তিনি আর উপরে উঠে আসেন নি।

বলো কি। মহারাজ আর্তনাদ করে উঠলেন, তারপর তিনি ছুটে গেলেন দীঘির পাড়ে। আঁপিয়ে পড়লেন দীঘির পানিতে।

সঙ্গে যারা ছুটে এসেছিলেন তারাও মহারাজের সঙ্গে দীঘির পাড়ে তখন মহারাজের জ্ঞান ছিলো না অনেক চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরে এলো কিন্তু তার স্বাভাবিক অবস্থা আর ফিরে এলো না।

উন্মাদ হয়ে গেলেন মহারাজ জ্যোতিষ্ক।

কথাগুলো এতক্ষণ এক নিশ্বাসে বলে গেলো বৃদ্ধ দাইমা, ঘোলাটে চোখ দুটো তার ছলছল হয়ে উঠলো।

নূরী এবং অন্য সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে তাকিয়ে আছে। দাইমার শেষ কথা শোনার জন্য।

দাইমা বললো–আমি তখন ছোট মহারাজের যে অবস্থা দেখেছি, তা এখনও ভুলতে পারিনি। পাগল, রাজা দাড়ি গোঁফ আর জটাধরা চুল মাথায় পথে পথে ঘুরে বেড়াতে। রাজ্যের তখন ছন্নছাড়া অবস্থা। রাজাবিহীন রাজ্য কত দিন টিকিবে একদিন সব গেলো রাজা জ্যোতিষ্কও নিঃশেষ হয়ে গেলো কিন্তু মহারাণীর আর কোনো হদিস পাওয়া গেলো না।

এই সেই রাজপ্রাসাদ আর এই সেই দীঘি।

কিন্তু কি জানিস তোরা ঐ যে সন্ন্যাসী যে রাণীকে দীঘি খনন করে প্রতি রাতের শেষ প্রহরে স্নান করতে বলেছিলো একজন শয়তান। মহারাজের প্রতি ছিলো ভীষণ রাগ, রাণীকে–হরণ করার জন্যই সে এই চক্রান্ত করেছিলো। শয়তান লোকটা জানতো মহারাজ রাণীকে অত্যন্ত ভালবাসেন। কোনোক্রমে রাণীকে সরাতে পারলেই রাজা উন্মাদ হয়ে যাবে তখন তার রাজ্যও ধ্বংস হবে।

শয়তানের চক্রান্ত মহারাজ উন্মাদ হলেন। তার এত সাধের রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো।

মহারাজের লোকজন বহুদিন রাজপ্রসাদ ঘিরে অবস্থান করলো কিন্তু রাজা বিহীন রাজ্য কি রক্ষা পায়, সব এক এক করে চলে গেলো।

শুধু আমার বাবা রয়ে গেলো রাজপ্রাসাদের রক্ষী হিসেবে। বাবাকে আমি সব সময় ঐ দীঘির পাড়ে ঘুরে বেড়াতে দেখতাম। আর বাবা বিড়বিড় করে কি যেন সব বলতো।

যখন বড় হলাম তখন বাবাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম–বাবা তুমি দীঘির পাড়ে বসে বসে সব সময় কি ভাবো বলো তো?

বাবা বললো–তুই তো সব জানিস মা। রাণী এই দীঘিতে স্নান করতে নামলো আর সে উঠলো না। মারা পড়লে তার লাশ ভেসে উঠবে কিন্তু তাও উঠলো না তবে তিনি গেলো কোথায়? আমার কি মনে হয়ে জানিস মা, ঐ সন্ন্যাসীটার সব চক্রান্ত। কোন সুড়ঙ্গপথ আছে ঐ দীঘির তলে। সেই পথে রাণীজীকে সন্ন্যাসী বেটা সরিয়েছে। যখন ঐ দীঘির খননকাজ শুরু হয় তখন সন্ন্যাসী বেটা উধাও হয়েছিলো। আমার মনে হয় সেও ঐ দীঘির খননকাজে যোগ দিয়েছিলো এবং গোপনে কোন সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে নিয়েছিলো। তারপর সেই সুড়ঙ্গ পথে রাণীজীকে

নূরী বলে উঠলো–তোমার কি মনে হয় দীঘির নিচে কোন সুড়ঙ্গ পথ আছে?

হাঁ, আমার তাই মনে হচ্ছে।

তবে কি বনহুর স্বেচ্ছায় তলিয়ে গেছে নিচের দিকে না কোন চক্রান্ত–নূরী কথাগুলো আপন মনে বললো।

বনহুরকে নিয়ে যখন তার আস্তানায় সবাই উদ্বিগ্ন তখন বনহুর একটি জলস্রোতের মুখে ভেসে চলেছে। নিশ্চুপ দীঘির নীল পানির তলদেশে এমন একটা জলস্রোত ছিলো বনহুর ভাবতে পারেনি।

বনহুর ভেবেছিলো ডুবসাঁতার দিয়ে নূরীকে ছাড়িয়ে যাবে কিন্তু হঠাৎ একটা স্রোতে তাকে টেনেনিলো নিচের দিকে। বনহুর অনেক চেষ্টা করে রেহাই পেলোনা সেই ভীষণ জলস্রোতের আকর্ষণ থেকে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে তার।

ভীষণ জলস্রোতের টানে অনেক দূরে চলে এসেছে বনহুর। হঠাৎ হাতের কাছে কিছু একটা পেয়ে ধরে ফেললো। দেখলো একটা সুড়ঙ্গমুখে সে আটকে পড়েছে।

দমবন্ধ হয়ে আসছিলো বনহুরের আর একটু হলেই মারা পড়বে ঠিক ঐ মুহূর্তে ভেসে উঠলো সে পানির উপরে। প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিলো তারপর তাকিয়ে দেখলো যেখানে সে ভেসে উঠেছে সে জায়গা তার নীল দীঘি নয়। এক নতুন জায়গা সচ্ছ আকাশে চাঁদ হাসছে।

তার সে দীঘি এটা নয়।

বনহুর সাঁতার কেটে এগুতেই পা মাটি স্পর্শ করলো।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর।

সম্মুখে তাকিয়ে দেখলো এক অদ্ভুত রহস্যময় গুহা। বনহুর সাঁতার কেটে তীরে এলো এবং সেই গুহা। অভিমুখে পা–বাড়ালো।

গুহামধ্যে প্রবেশ করতেই রাশি রাশি মাকড়সার জাল তার চোখেমুখে বেষ্টন করলো।

বনহুর মাকড়সার জাল ছিন্ন করে এগুলো রহস্যময় গুহার মধ্যে। যতই এগুচ্ছে ততই বিস্মিত হচ্ছে–গুহামধ্যে যে কোন কালে মানুষ বসবাস করতো তার সুস্পষ্ট ছাপ নজরে পড়ছে। প্রথমেই বনহুরের দৃষ্টিতে পড়লো কিছু মাটি খননের সরঞ্জাম গুহামধ্যে রক্ষিত রয়েছে। মাটি খননের সরঞ্জামগুলো বহুকাল স্তূপাকৃত অবস্থায় পড়ে থাকায় সেগুলো অব্যবহার্য হয়ে পড়েছে। সে গুলো লোহার তৈরি হলেও তার এখন মাটিতে পরিণত হয়েছে। বনহুর এগুলো থেকে দু'একটা বস্তু হাতে তুলে নিয়ে দেখলো।

বস্তুগুলো হাতে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে কতক অংশ খসে পড়লো তার হাত থেকে। বনহুর ফেলে দিয়ে পুনরায় অগ্রসর হলো যত এগুচ্ছে ততই আরও বিব্রত হচ্ছে। একটা উঁচু স্থানে পাশাপাশি অনেকগুলো মানুষের কঙ্কাল।

কঙ্কালগুলো ছড়িয়ে আছে।

বনহুরের পা কঙ্কালগুলোতে স্পর্শ হাবার সঙ্গে সঙ্গে কঙ্কালগুলো ছাই ভূপের মত মিশে যেতে লাগলো। বনহুর আরও এগুচ্ছে।

হঠাৎ বনহুর চমকে উঠলো দেখতে পেলো এক জায়গায় কতকগুলো পরচুলা গুহার দেয়ালে ঝুলছে। পরচুলাগুলো অদ্ভুত ধরনের। চুল তো নয়, একরাশ জটাজুটা জটার মধ্যে কিছু পরিলক্ষিত হচ্ছে। বনহুর ভাল করে লক্ষ করতেই ভীষণভাবে চমকে উঠলো।

জটাজুটের মধ্যে ফনা বিস্তার করে আছে বিষধর সাপ।

বনহুর চমকে দু’পা পিছিয়ে গেলে তারপর একটা মোটা মোটা শুকনো ভাল আগাছা থেকে ভেঙে নিয়ে জটাজুটের উপর সর্পরাজগুলোর দেহে আঘাত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে জটাজুট ও দাড়িগোফগুলো দেয়াল থেকে খসে পড়লো গুহার মেঝেতে।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো সাপগুলো তখনও ঐ জটাজুটের মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়েনি। ঠিক যেমনটি ছিলো তেমনটিই আছে।

এবার বনহুর আপন মনেই হেসে উঠলো, তারপর জটাজুটসহ সর্প রাজগুলোকে তুলে নিলো হাতে। অবাক চোখে দেখলো বনহুর, ঐ জটাজুটগুলো অদ্ভুত এক ধরনের লোম দিয়ে তৈরি যা দীর্ঘদিনের পরও বিনষ্ট হয়ে যায়নি। সর্পরাজগুলো আসল নয় নকল, তবে কি দিয়ে সেগুলো তৈরি বনহুর তা বুঝতে পারলো না। দেখলে মনে হয় একেবারে জীবন্ত সাপ তাতে কোনো ভুল নেই।

বনহুর বেশ কিছুক্ষণ ধরে জটাজুটগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো যদিও সেগুলো মাকড়সার জালে এলোমেলো হয়ে পড়েছে কিন্তু আসলে ঠিকই আছে! লোমগুলো যে কিসের তা বুঝতে পারলো না বনহুর। সাপগুলোও তেমন অদ্ভুত কোনো বস্তু দিয়ে তৈরি যা অবিকল সাপের মত।

বনহুর গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। গুহা নয় যেন এক রহস্য পুরি। মাটি খননের লৌহ সরঞ্জাম, পাকার কঙ্কাল অদ্ভুদ জটা জুট দাড়ি গোঁফ তার মধ্যে বিস্ময়কর সর্পরাজ...... বনহুর এগুতে লাগলো। গুহা মুখ সরু হলেও ভিতরে দিকটা বেশ প্রশস্ত। দুঃস্থানে সুউচ্চ পাষাণ প্রাচীর।

সুড়ঙ্গ পথ চলে গেছে আরও ভিতরে।

মাঝে মাঝে প্রশস্ত গুহা।

বনহুর এগুচ্ছে, দু’চোখ তার বিষয়। আরও কিছুটা এগুতেই ভয়ঙ্কর একটা শব্দ শুনতে পেলো বনহুর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। এখন গুহা মধ্যে ঝাপসা অন্ধকার লাগছে।

বনহুর তাকালো সম্মুখে।

একটা অদ্ভুত ধরনের জন্তু এগিয়ে আসছে তার দিকে। জন্তুটা দাঁতে দাঁত দিয়ে শব্দ করছিলো কেমন কট কট শব্দ।

আধো অন্ধকারে জন্তুটার দাঁতগুলো সাদা ধপ ধপে দেখা যাচ্ছে এগুচ্ছে জন্তুটা ধপ ধপ করে। জন্তুটার পাগুলো হাতির পায়ের মত মোটা বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তার পরনে সাঁতারের ড্রেস ছাড়া আর কিছু ছিলো না। কোন অস্ত্র নেই তার কাছে।

জন্তুটা ঠিক তেমনি শব্দ করছে।

দাঁতগুলো লুকিয়ে অন্ধকারে বিদ্যুতের মত চমকাচ্ছে মেঘ।

বনহুর লুকিয়ে আত্বগোপন করবে এমন জায়গাও পাচ্ছে না পিছু হটবে তারও কোন উপায় নাই। জন্তুটা তাকে লক্ষ্য করে এগুচ্ছে ঠিক বুঝতে পারে বনহুর।

না জানি কোন মুহূর্ত ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে, বনহুর মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়। কারণ জীবটার কবল থেকে তার রক্ষা নাই কোন ক্রমে।

জন্তুটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে।

কি ভয়ঙ্কর জন্তু।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর তাকিয়ে আছে জন্তুটার দিকে।

হেলান দিয়ে আছে যে পাষাণ প্রাচীরের গায়ে।

হঠাৎ পাষাণ প্রাচীরটা দুলে উঠলো।

বনহুর টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো যেখানে সে হেলান দিয়েছিলো ঐ জায়গাটা ফাঁকা ছিলো কিংবা আগলা কোনো পাথরখণ্ড দাঁড় করানো ছিলো সেখানে।

বনহুর পড়ে গিয়েই উঠে দাঁড়ালো।

দেখলো সে অপর একটা সুড়ঙ্গমুখে প্রবেশ করেছে। বনহুর কালবিলম্ব না করে ছুটতে লাগলো সেই নতুন গুহা বা সুড়ঙ্গ ধরে।

পিছনে থপ থপে জন্তুটার এদিকে আসবে না সে সোজা চলে যাবে বুঝতে পারছে না বনহুর, সে দ্রুত কিছুটা ছুটলো নতুন গুহাপথে।

বেশ হাপিয়ে পড়েছে বনহুর।

সেই সাঁতার প্রতিযোগিতায় নামাবার পূর্বে কিছু ফলমূল খেয়েছিলো বনহুর তারপর থেকে কিছু মুখে, পড়েনি। ক্ষুধা অনুভব করছে বনহুর ভীষণভবে তারপর ভয়ঙ্কর জীবটার ভীষণ তাড়া।

বনহুর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দৌড়ালো।

ললাটে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বারবার বনহুর হাতের পিঠে ঘাম মুছে ফেলছে। তবু পুনরায় মেঘে নেয়ে উঠছে তার দেহটা।

জন্তুটার দাঁতের কটকট আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। ভীষণ আওয়াজ, বুকটা যেন কেঁপে উঠে সে শব্দের প্রতিধ্বনিতে।

বনহুর বসে পড়লো অনেকটা পথ সে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দৌড়ে এসেছে তাই বড় ক্লান্তি বোধ করছিলো। বসে পড়ে রীতিমত হাঁপাচ্ছে বনহুর।

ততক্ষণে বাইরে আকাশে ভোরের সূর্য উদয় হয়েছে।

যখন ঘুম ভাঙে তখন চোখে মেলতেই অবাক হলো এক ঝলক সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখেমুখে। উপরের দিকে তাকালো কিন্তু আকাশ বা সূর্য দৃষ্টি হলো না। তবে সূর্যের আলো কোন পথে এলো এই গুহামধ্যে। একটু পরই বুঝতে পারলো গুহার দেয়াল একপাশে ধ্বসে পড়েছে এবং সেইপথেই সূর্যের আলো প্রবেশ করেছে গুহার মধ্যে।

বনহুর খুশি হলো, এবার সে গুহার বাইরে পেরিয়ে যাবার পথ পেয়েছে।

যেমনি বনহুর উঠে দাঁড়িয়েছে অমনি সে দেখতে পেলো তার পাশে যেখানে এতক্ষণ বসে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাচ্ছিলো ঠিক সেখানে একটা কঙ্কাল।

সূর্যের আলোতে কঙ্কালের গলায় ঝকমক করছে একটা বস্তু।

বস্তুটা থেকে এক নীলাভ রশ্মি বেরিয়ে আসছে।

অদ্ভুত এক আলোক ছটা।

বনহুর যেখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমিয়েছিলো ঠিক তার পিছনে ছিলো ঐ কঙ্কাল।

বনহুর কঙ্কালটার পাশে বসে পড়লো।

হাঁ, মূল্যবান বস্তুই বটে। বনহুর বুঝতে পারলো যে কঙ্কালটার পাশে এখন বসে আছে তা কোনো নারীর কঙ্কাল এবং তার জীবিত অবস্থা ঐ লকেটযুক্ত মালা ছিলো তার গলায়। বস্তুকালের ব্যবধানের পরও কঙ্কালটির গলায় মালাছড়া ঠিক পূর্বে উজ্জ্বল দীপ্ত আছে। অতি মূল্যবান এ হার বা মালা এরই নাম মনিহার।

মনিহার, বনহুর আলগোছে তুলে নিলো কঙ্কালের স্তূপ থেকে। মনে পড়লো ফুল্লরার মুখ, ফুল্লরা বলে ছিলো, আমাকে তুমি মনিহার দেবে।

এই মনিহার বনহুর ফুল্লরাকে দেবে, দীপ্ত হয়ে উঠলো তার চোখ দুটো।

কিন্তু এ কঙ্কাল কার? যার কণ্ঠে ছিলো এত মূল্যবান মনিহার। বনহুর ভাবতে থাকে কঙ্কালটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে–না জানি কার কঙ্কাল এবং এখানে কি করেই বা এলো! মাটি খনন দ্রব্য এবং ঐ পাকাল কঙ্কালগুলোকে সঙ্গে এ কঙ্কালের কিইবা সম্বন্ধ–বনহুরের মাথাটা যেন ঝিম করতে থাকে। বুঝতে পারে না কেন তার এমন লাগছে। মনিহারটা তার সাঁতারু ড্রেসের প্যান্টের পকেটে যত্ন করে রেখে দেয়, তারপর দেয়ালে ঠেশ দিয়ে বসে পড়ে সে। চোখ দুটো আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে।

বনহুর সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে।

সে দেখতে পাচ্ছে একজন জটা জুটধারী সন্ন্যাসী একটা নারীকে কাঁধে তুলে নিয়ে এগুচ্ছে গুহার দিকে। নারীর বসন সিক্ত তাকে জলধারা মধ্য থেকে তুলে আনা হয়েছে। চুল এলোমেলো ছড়িয়ে আছে পিঠে কাঁধে! সন্ন্যাসীর কাঁধে হাত-পা ছুড়ছে নারী। নারী সন্ন্যাসীর কবল থেকে বাঁচার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করার জন্য এগুচ্ছে না। বনহুর বিস্ময় ভরা চোখে দেখছে। সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না যেন। কে যেন তার হাত-পা বেধে রেখেছে। চিৎকার করে সন্ন্যাসীকে রুখতে বলবে তাও পারছে না, গলা যেন কেউ চেপে ধরেছে। সন্ন্যাসী নারীটাকে নিয়ে রহস্যময় গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। তাকে আক্রমণ করলো সন্ন্যাসী। নারীদেহে মূল্যবান বসন, গলায় সেই মনিহার।

বনহুর মনিহার দেখে চিনতে পারলো এই সেই মনিহার যে মনিহার কঙ্কালটার গলায় ছিলো। বনহুর আবার এগিয়ে যায় স্বপ্নের রাজ্যে। নারীটি মরিয়া হয়ে উঠেছে সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে নারীর চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

হঠাৎ সন্ন্যাসীর কবল থেকে নারীটি নিজেকে মুক্ত করে নেয়। তারপর সে ছুটতে থাকে উঠিপড়ি করে গুহার ভিতরে এ পথ সে পথ করে।

সন্ন্যাসী ছুটতে থাকে নারীর পিছনে।

যেমন করে শিকারী কুকুর ছোটে তার শিকারের পিছনে। বনহুর নির্বাক হয়ে দেখছে কে যেন তার সব শক্তি হরণ করে নিয়েছে।

সেকি ভীষণ এক অবস্থা।

সন্নাসী নিজের মাথা নতবেশী সন্ন্যাসীর জটাজুট খুলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, খুলে ফেলে দাঁড়ি, গোঁফ, তারপর ধাওয়া করে লোকটা সেকি ভীষণ চেহারা লোকটার।

নারী পিছন ফিরে তাকালো, একবার দেখে নিয়ে ভীতা হরিণীমত ছুটতে লাগলো কেমন করে সে ইজ্জত রক্ষা করবে ঐ শয়তানটার কবল থেকে। হঠাৎ দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলো, তারপর দেয়াল বন্ধ হলো। যেমন ছিলো ঠিক তেমনি করে। বনহুর লক্ষ্য করে দেখলো ঐ সেই দেয়াল, যে দেয়ালে ঠেশ দিতে গিয়ে বনহুর নিজে পড়ে গিয়েছিলো এবং জন্তুটার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলো।

তেমনি মেয়েটাকেও আর নরপতি সন্ন্যাসী বেশধারী শয়তান ধরতে পারবোনা, দৃষ্টির আড়ালে অন্তর্হিত হলো নারী।

নরশয়তান আর তাকে খুঁজে পাচ্ছে না।

ওদিকে নারী ইজ্জত রক্ষা পেলো কিন্তু আবদ্ধ হলো সে এক রহস্যময় গুহামধ্যে যে গুহা থেকে সে আর কোনোদিন বের হতে পারলো না।

ক্ষুধা পিপাসায় তিল তিল করে শুকিয়ে একদিন মৃত্যু হলো নারীটার তারপর তার শেষ পরিণতি হলো একটা কঙ্কাল.....

কঙ্কালটা জীবন্ত হয়ে উঠলো, ধীরে ধীরে ঠিক একটা শুভ্র বসনা নারীমূর্তি এগিয়ে এলো তার দিকে। বনহুর ভাল করে লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলো এ সেই নারী যে নারীটাকে কিছু পূর্বে ঐ সন্ন্যাসী ধাওয়া করেছিলো। সহায় করুণ চোখে তাকালো নারীটা, সে বাম্প রুদ্ধ কণ্ঠে বললো–আমাকে উদ্ধার করো.... আমাকে নিয়ে চলো আমার রাজপ্রাসাদে–ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুরের সংজ্ঞা ফিরে এলো। সে এতক্ষণ যে স্বপ্ন দেখছিলো তা যেন সব সত্য, সব বাস্তব বলে মনে হলো।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো তারপর এগুতে লাগলো সে, পা দু'খানা টলছে। সেই জলাশয়ের ধারে এসে দাঁড়ালো, নীল পানি এসে ছিঁড়ে আছড়ে পড়ল তার পায়ের কাছে। বনহুর বুঝতে পারে এই জলাশয়ের তলদেশে এমন এক জলস্রোত আছে যার সঙ্গে সংযোগ আছে তার আস্তানার সেই দীঘির।

মনে পড়লো নূরীর কথা।

না জানি সে কত উতলা হয়ে পড়েছে।

জলস্রোতের টানে তলিয়ে কোথায় চলে এসেছে বনহুর। কেউ জানে না, সে যে জীবিত আছে না মরে গেছে। তার অনুচরগণ হয়তো বা কত উতলা হয়ে পড়েছে। দীঘির পানির মধ্যে তার সন্ধান করে ফিরেছে তারা।

বনহুরের দেহে সাঁতারুর সামান্য পোশাক ছাড়া কোনো পোশাক ছিলো না। আশেপাশে তাকিয়ে দেখছে, কোথাও কোনো জনপ্রাণী নজরে পড়ে না।

সহস্যময় গুহা থেকে থেকে বেরুতে বনহুরকে বেশি বেগ পেতে হয়নি, কারণ পিছন অংশে একটা বিরাট ফটক ছিলো, যেদিক দিয়ে গুহা মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করেছিলো। বনহুর সংজ্ঞালাভ করার পর ঐ পথে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলো।

বনহুর বুঝতে পারলো গুহার পিছন অংশের ফাটল পূর্বে ছিলো না। যদি ঐ ফাটল পূর্বে থাকতো তবে ঐ মানুষ্যদেহটা হয়তো কঙ্কালে পরিণত হতো না। হয়তো বা বেরিয়ে আসতে সক্ষম হতো।

কঙ্কালের কথা মনে পড়েতই তারমনে উদয় হলো, হঠাৎ তার মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠায় সংজ্ঞা হারিয়েছিলো? তখন যে স্বপ্ন সে দেখছিলো তা কি সত্যি। যদি সত্য হয় তাহলে কে সেই সন্ন্যাসী বেশ ধারী নর শয়তান আর কেইবা সে নারী যার গলায় ছিলো মনিহার।

বনহুর মনিহারটা বের করে দেখতে লাগলো।

সূর্যের আলোতে ঝলমল করে উঠলো হারছড়া। এই হার ছড়ার সঙ্গে জড়ানো আছে না জানি কি। মর্মান্তিক কাহিনী.... বনহুর অন্যমনস্ক ভাবে পা–বাড়ালো জলাশয়ের দিকে। ক্ষুধা পিপাসায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে, নাড়ীভুড়ী হজম হবার জোগাড়। সম্মুখস্থ জলাশয়ের পানি তোলপাড় করছে শান্ত পানির তলায় কে যেন আলোড়ন তুলেছে।

বনহুর পানি পান করার জন্য জলাশয়ের দিকে উবু হয়ে যখন হাতে পানি তুলে নেবে, ঠিক ঐ সময় একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো তার দক্ষিণ পাশের মাটিতে।

বনহুর চমকে ফিরে তাকালো।

আরও একটা তীর সঙ্গে সঙ্গে চলে গেলো তার পাশ কেটে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সরে দাঁড়ালো, সে দেখতে পেলো সেই রহস্য গুহার সুউচ্চ চূড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে এলোকেশী এক নারীমূর্তি! তার চুল বাতাসে উড়ছে, পরনে কোনো জন্তুর চামড়া অথবা গাছের ছাল। হাতে তীর ধনু, নারীমুর্তি ধনুতে পুনরায় তীর সংযোজন করবার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পাশের এক পাথরখণ্ডের আড়ালে আত্মগোপন করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা তীর এসে বিদ্ধ হলো পাথরখণ্ডের পাশে।

বনহুর হাত বাড়িয়ে তীর ফলকটা তুলে নিলো।

[পরবর্তী বই খোন্দকার বাড়ি]

পূর্ববর্তী:

« ৬.০৭ ঘোলা জল

পরবর্তী:

৬.০৯ খোন্দকার বাড়ি »